ANTIQUITIES OF JAINTIA

ASIF AJHAR

জৈন্তিয়ার প্রাচীন নিদর্শন

আসিফ আযহার

ভূমিকা

উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের সভ্যতার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শাসকদের হাতে উত্তর-পূর্ব ভারত ও সিলেটের বিভিন্ন রাজ্য শাসিত হয়েছে। এসব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা রাজ্য ছিল জৈন্তিয়া। আনুমানিকভাবে ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কিছু আগে পূর্ব মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল ও উত্তর সিলেটের সমতল ভূমি নিয়ে রাজ্যটির উদ্ভব হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এটি কামরূপ অঞ্চলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত 'নারী রাজ্য' বা 'জয়ন্তী রাজ্য' হিসেবে পরিচিত ছিল। এই দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নারী সরদারদের হাতে শাসিত হয়েছে। ষষ্ঠ শতকের কোন এক সময়ে রাজ্যটির সমতল অংশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় কামরূপের এক নারী শাসকের হাতে। সপ্তম শতকে এই সমতল অংশ ভেঙ্গে লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া নামে তিনটি পৃথক রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে। আদি জৈন্তিয়া রাজ্য তখন মূলত চারটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

পূর্ব মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল ছিল মাতৃপ্রধান পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন। আর সমতলের লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া ছিল তিনটি নতুন রাজবংশের শাসনাধীন। সপ্তম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সমতলের জৈন্তিয়া রাজ্যটি দুটি আলাদা রাজবংশের হাতে শাসিত হয়েছিল। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই রাজ্য আবারও পাহাড়ি মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ততোদিনে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তাদের সমাজে নারী সরদারের স্থলে পুরুষ সরদারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরদারের উপাধি ছিল 'সিয়েম'। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে জৈন্তিয়া সমতলে সিয়েমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যটি তখন নতুন শক্তিতে ঘুরে দাঁড়ায়। পাহাড় ও সমতল আবারও পাহাড়ি শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। পরবর্তী তিন শতক ধরে পাহাড় ও সমতলের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিই রাজ্যটিকে প্রতিবেশীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অবশেষে ১৮৩৫ সালে রাজ্যটি ব্রিটিশদের হস্তগত হয়।

কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি জৈন্তিয়া রাজ্যের পাহাড় ও সমতল অঞ্চল বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল ছিল পাহাড়ি রাজাদের সময়কার

জৈন্তিয়া রাজ্যের সমভূমি। আর ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড় ও পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড় জেলাদ্বয় ছিল তাদের রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চল। সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট উপজেলাজুড়ে জৈন্তিয়া সমভূমি বিস্তৃত ছিল। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশও জৈন্তিয়া সমভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। চার উপজেলার এই সমভূমি অঞ্চলে জৈন্তিয়ার ১৮টি রাজ বা পরগণার অস্তিত্ব ছিল। এই ১৮টি রাজ বা পরগনার নাম হচ্ছে- জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং, চারিকাটা, ফালজুর, ধরগাম, চতুল, খরিল, পাঁচভাগ, আড়াইখা, চাউরা, মুলাগুল, সাতবাক, বাজেরাজ, পশ্চিমভাগ, বড়দেশ, বাউরভাগ, বর্ণফৌদ, পিয়াইনগুল। অন্যদিকে মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড়ে ছিল জৈন্তিয়ার রাজ্যের ১২টি পার্বত্য রাজ বা এলাকা (প্নার শব্দ এলাকা অর্থ হল পার্বত্য পুঞ্জি)। এগুলোর নাম হচ্ছে- Sutnga, Nartiang, Nongtalang or Natelang, Nangphyllut or Norpuh, Nongjngi, Nangbah, Lakadong, Shangpung, Mynso, Jowai, Raliang, Amwi or Rambhai.

জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতলে আজও রাজ্যটির কিছু মূল্যবান নিদর্শন টিকে রয়েছে। এগুলো হচ্ছে জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা বা স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ (স্থাপনাবিহীন কিছু ঐতিহাসিক স্থানও রয়েছে)। আজ অবধি জৈন্তিয়া রাজ্যের এসব মূল্যবান নিদর্শন সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মিলে না। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের অস্পষ্টতাই এর জন্য দায়ী। *জৈন্তিয়ার প্রাচীন নিদর্শন* বইটিতে জৈন্তিয়ার বিভিন্ন অক্ষত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনাসমূহের প্রকৃত ইতিহাস তোলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জৈন্তিয়ার রাজাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত তাম্রলিপি, শিলালিপি, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি বিষয়েও কিছু আলোচনা যুক্ত করা হয়েছে। এই বইটি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের কোন পূর্ণাঙ্গ দলিল নয়। বইটিতে শুধুমাত্র জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ দলিল *জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

- আসিফ আযহার, সেপ্টেম্বর ২০২৬

অধ্যায় এক
জৈন্তিয়া রাজ্যের পরিচিতি

উত্তর-পূর্ব ভারত ও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের সভ্যতা বেশ প্রাচীন। পৌরাণিক যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ ও জনগোষ্ঠীর হাতে এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভূখণ্ড শাসিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই অঞ্চলে যেসব রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন রাজ্য ছিল জৈন্তিয়া। ঋষি জৈমিনি কর্তৃক রচিত *জৈমিনি মহাভারতের* (*জৈমিনি অশ্বমেধ পর্ব* নামেও পরিচিত) বর্ণনা অনুযায়ী, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; তখন রাজ্যটি শাসন করতেন বীর রানী প্রমীলা। আনুমানিকভাবে, ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রমীলা জৈন্তিয়ার শাসক ছিলেন। তখন থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি আদি রাজ্য ভেঙ্গে নতুন রাজ্য বা রাজ্যসমূহের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু জৈন্তিয়ার ক্ষেত্রে তা ভিন্ন। অন্য কোন রাজ্য থেকে এটি উদ্ভূত হয়নি। যখন থেকে এই অঞ্চলে মানববসতির সূচনা হয় তখন থেকে এই রাজ্যটিরও উদ্ভব হয়।

কয়েক হাজার বছর ধরে এক অনন্য সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে টিকে থাকার পর ১৮৩৫ সালে এটি ব্রিটিশদের হস্তগত হয়। বর্তমানে এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্ত। বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল ছিল সাবেক জৈন্তিয়া রাজ্যের সমভূমি। আর ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড় ও পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড় জেলাদ্বয় ছিল সাবেক জৈন্তিয়া রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চল। সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট উপজেলাজুড়ে জৈন্তিয়া সমভূমি বিস্তৃত ছিল। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশও জৈন্তিয়া সমভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অংশটি হল- দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়ন ও উত্তর রনিখাই ইউনিয়ন। চার উপজেলার এই সমভূমি অঞ্চলে জৈন্তিয়ার ১৮টি রাজ বা পরগণার অস্তিত্ব ছিল। অন্যদিকে মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড়ে এই রাজ্যের আরও ১২টি রাজ বা এলাকার (প্নার শব্দ এলাকা অর্থ হল পার্বত্য পুঞ্জি) অস্তিত্ব ছিল।

পৌরাণিক যুগে এই রাজ্যটির আয়তন কতটুকু ছিল তা জানা যায় না। *জৈমিনি মহাভারতে* রাজ্যটির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে শুধু এর অস্তিত্বের কথা

জানা যায়। তখন এটি একটি নারীশাসিত রাজ্য ছিল। কয়েক হাজার বছর ধরে এই নারীশাসন চালু ছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এখানে পুরুষ রাজাদের শাসন শুরু হয়। হাটক নামক এক যুবক ছিলেন জৈন্তিয়ার প্রথম পুরুষ রাজা। তাঁর আমলে বৃহত্তর সিলেটের পূর্বাঞ্চল ছাড়া বাকি অংশ ছিল জৈন্তিয়ার অধীনে। হাটকের পুত্র গুহক ছিলেন এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শেষ একক শাসক। তাঁর পরে এই অঞ্চলটি ভেঙ্গে তিনটি আলাদা রাজ্যে পরিণত হয়। যথা- লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া। পশ্চিম সিলেট ছিল লাউড়ের অন্তর্ভুক্ত। মধ্য সিলেট ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। আর উত্তর সিলেট ছিল জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব সিলেট আগে থেকেই কামরূপের অধীনে ছিল।

লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া রাজ্যের মধ্যে সিলেট সমতলের ভাগাভাগি হয় আনুমানিকভাবে ৬০০ সাল থেকে ৬৫০ সালের মধ্যে। তখন জৈন্তিয়ার ভাগে যে অংশটুকু পড়েছিল তা ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার সমভূমি হিসেবে সার্বভৌম ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্যের মূল অংশ ছিল এই সমভূমি। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জৈন্তিয়ার শাসকদের আনুগত্য করেননি। এর কারণ, জৈন্তিয়ার প্রথম পুরুষ রাজা হাটক ছিলেন একজন তিব্বতীয়। তাঁর মাতা ছিলেন কামরূপের রাজকন্যা। ভিন্ন জাতির হওয়ায় জৈন্তিয়া পাহাড়ের আদি জনগোষ্ঠী হাটকের বংশধরদের আনুগত্য করেনি। এই রাজবংশের আগের শাসকরা অর্থাৎ নারী শাসকরা জৈন্তিয়া পাহাড়ের মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীরই সরদার ছিলেন বলে অনুমেয়। স্বজাতীয়দের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তারা সিলেট সমতলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

রাজা হাটকের বংশধররা জৈন্তিয়া সমতলের অধিপতি হলেও জৈন্তিয়া পাহাড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ অতি দূর্বল ছিল অথবা ছিল না বলেই অনুমেয়। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (১৫০০ সালের দিকে) জৈন্তিয়া সমতলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর শাসকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে আবারও পাহাড় ও সমতল একীভূত হয়ে যায়। পাহাড় ও সমতলের এই ঐক্য রাজ্যটিকে বেশ সুরক্ষা দিয়েছিল। অপ্রতিরোধ্য ও স্বাধীনচেতা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর কারণেই শক্তিশালী মোগলরা জৈন্তিয়া দখল করতে চাননি। ব্রিটিশরাও প্রথমদিকে জৈন্তিয়া দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। জৈন্তিয়া পাহাড়ের বর্তমান অধিবাসীরা নিজেদেরকে ‘সিন্টেং’ বা ‘জৈন্তিয়া’ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দেন। নারী রাজ্যের যুগে এই জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিবেশী খাসিয়া জনগোষ্ঠী একই আদি জনগোষ্ঠীর

অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। নারী শাসিত আদি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত খাসিয়া ও সিন্টেং জনগোষ্ঠী আজও মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত।

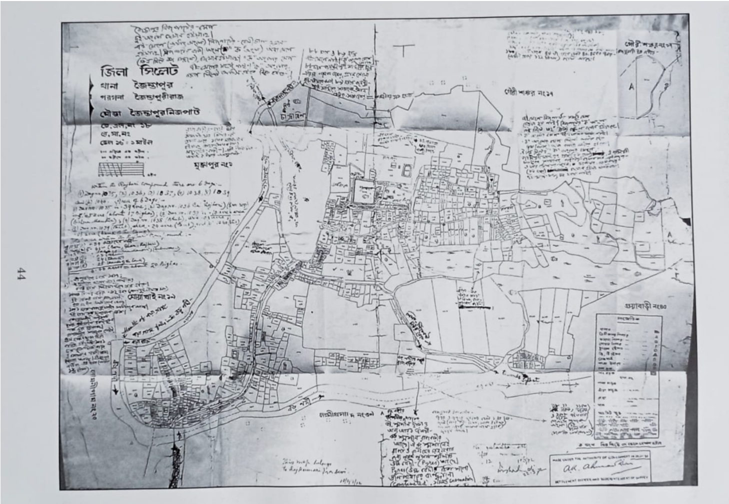
অধ্যায় দুই
জৈন্তিয়া রাজ্যের নাম ও রাজধানীর নাম

জৈন্তিয়া রাজ্যের আদি নাম ছিল 'জয়ন্তী'। *জৈমিনি মহাভারতে* এই নামটিই উল্লিখিত হয়েছে। সনাতন ধর্মের একজন দেবীর নামও 'জয়ন্তী'। এই দেবী জৈন্তিয়া অঞ্চলের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত। ধারণা করা হয় যে, জয়ন্তী ছিলেন জৈন্তিয়া রাজ্যের আদি শাসক। তিনিই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামে রাজ্যটির নামকরণ হয়েছিল নাকি রাজ্যটির নামে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন তা নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। যদি আগে থেকেই এই অঞ্চলের নাম 'জয়ন্তী' হয়ে থাকে তাহলে এর অধীশ্বরী হিসেবে তিনি এই নাম ধারণ করে থাকতে পারেন (আবার উল্টোটাও হতে পারে)। তিনি ছিলেন *জৈমিনি মহাভারতে* বর্ণিত রানী প্রমীলার আগের যুগের শাসক। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

শুধু এটুকু অনুমান যেতে পারে যে, তিনি ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে 'জয়ন্তী' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গবেষকদের মতে, মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক ৩১০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে; এর কয়েক বছর পরেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। তখন প্রমলা ছিলেন জৈন্তিয়ার রানী। তাঁর শাসনামলের অনির্দিষ্টকাল আগে রানী জয়ন্তীর হাতে রাজ্যটি শাসিত হয়েছিল। এই আদি নারী শাসক একসময় জৈন্তিয়া সমতলের সনাতনবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। জয়ন্তী দেবী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবী হিসেবে তিনি আজও বেশ প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিক সাহিত্যে এই দেবীর নাম এবং জৈন্তিয়া রাজ্যের নাম 'জয়ন্তী' হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। *কামাখ্যাতন্ত্র*, *তন্ত্রচূড়ামণি*, *কালিকাপুরাণ* ও *ভবিষ্যপুরাণে* 'জয়ন্তী' বা 'জয়ন্ত্যাং' শব্দের বার বার উল্লেখ দেখা যায়।

দ্বাদশ শতকে (১১০১ – ১২০০ সাল) রচিত *রাঘবপাণ্ডবীয়* কাব্যগ্রন্থে 'জয়ন্তীপুর' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীণ জৈন্তিয়ার রাজা কামদেবের রাজধানী ছিল জয়ন্তীপুর। যতদিন পর্যন্ত জৈন্তিয়া রাজ্য টিকে ছিল ততোদিন পর্যন্ত রাজধানী এই নামেই ছিল। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের আমলের যেসব তাম্রফলক উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোতে 'জয়ন্তীপুর পুরন্দর' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। 'জয়ন্তীপুর পুরন্দর' কথাটির মানে হল 'জয়ন্তীপুরের শাসক বা রাজা'।

সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের চালু করা মুদ্রাগুলোতেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বানানে এই কথাটির উল্লেখ রয়েছে। সিন্টেং রাজাদের আমলের দুই ধরণের মুদ্রা পাওয়া যায়- পূর্ণমুদ্রা ও সিকিমুদ্রা। সিকিমুদ্রাগুলোতে রাজার (যিনি মুদ্রা চালু করেছেন) নাম উল্লিখিত থাকলেও পূর্ণমুদ্রাগুলোতে রাজার নামের বদলে ‘জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য’ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। ‘জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য’ কথাটির মানে হল ‘জয়ন্তাপুরের শাসক বা রাজা’। জৈন্তিয়ার মুদ্রা ও তাম্রফলকে ‘জয়ন্তীপুর’ বা ‘জয়ন্তাপুর’ শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, এই শব্দটি দ্বারা রাজ্য এবং রাজধানী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।



চিত্র: ব্রিটিশ আমলে জয়ন্তীপুর নগরীর নাম ছিল ‘নিজপাট মৌজা’

জৈন্তিয়া রাজ্য সম্পর্কে এর প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাস থেকে অনেক কিছু জানা যায়। সেসব দলিলে জৈন্তিয়া রাজ্যকে ‘জয়ন্তীয়া’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোচবিহারের ইতিহাস *বংশাবলি*, শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত *ত্রিপুরার ইতিহাস (রাজমালা)*, শ্রী পদ্মনাথ বরুয়া সম্পাদিত *অসমৰ বুৰঞ্জী*, রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া রচিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থে জৈন্তিয়া রাজ্যকে ‘জয়ন্তীয়া’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোগলানের (সিলেটের যেসব অংশ মোগলদের অধীনস্থ ছিল) ইতিহাসেও ‘জয়ন্তিয়া’ বা

'জয়ন্তীয়া' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে 'জয়ন্তীয়া' শব্দটির স্থলে 'জৈন্তিয়া' শব্দটির প্রচলন হয়। এর কারণ, ব্রিটিশরা বিভিন্ন ইংরেজি দলিলপত্রে এই অঞ্চলের জন্য 'Jaintia' শব্দটি ব্যবহার করতো। স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে এই শব্দটি আরও সংক্ষেপিত হয়ে 'জৈন্তা' শব্দেও উচ্চারিত হয়। বর্তমান 'জৈন্তাপুর' উপজেলার নাম এর অন্যতম উদাহরণ। সাবেক রাজধানীর নামে এই উপজেলাটির নামকরণ করা হয়েছে। সাবেক রাজধানীটি বর্তমানে 'জৈন্তাপুর সদর' বা 'নিজপাট' নামে পরিচিত।

অধ্যায় তিন
জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ড ও অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ

পৌরাণিক যুগে জৈন্তিয়া রাজ্য একটি ‘নারী রাজ্য’ হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে (১ সাল – ৫০০ সাল) এই রাজ্যের আয়তন ছিল অনেক বেশি। পূর্ব মেঘালয়, বৃহত্তর সিলেট এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চল তখন জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজ্যের উত্তর ও পূর্বদিকে ছিল কামরূপ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল কিরাতদেশ বা ত্রিপুরা আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছিল গঙ্গারিদাই বা বঙ্গ। তবে রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলেই তখন জনবসতি গড়ে ওঠেনি। বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমতলভূমি তখন অনেক গভীর ছিল; স্থলভাগ ছিল খুবই অল্প। সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যবর্তী হাওর এলাকা তখন ‘সাগর’ হিসেবে বিবেচিত হতো। এই সাগরটি বঙ্গ ও নারী রাজ্যকে ভৌগলিকভাবে আলাদা করে রেখেছিল।

ষষ্ঠ শতকে (৫০১ – ৬০০ সাল) কামরূপের একটি খণ্ডরাজ্যের রানীর হাতে নারী রাজ্যের পতন হয়। কামরূপের এই রানীর বংশধররা নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়ার সমতল অংশের শাসক হয়েছিলেন; পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব মেঘালয় ছিল মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর এলাকা (এদেরই নারীপ্রধান আগে বৃহত্তর জৈন্তিয়া রাজ্যের রানী বিবেচিত হতেন)। জৈন্তিয়ার এই আদি জনগোষ্ঠীটি খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে নিজেদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলেছিল। একসময় তারা খাসিয়া ও সিন্টেং নামে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে (সিন্টেং জনগোষ্ঠীর অপর নাম জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী)। সময়ের পরিক্রমায় তাদের সামাজিক নিয়মে কিছু পরিবর্তনও এসেছিল। মূল মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা নারী সরদারদের স্থলে পুরুষ সরদারদের শাসন চালু করেছিল। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর প্রধান সরদার বা সিয়েম জৈন্তিয়া সমতলের কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। তখন থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতল ছিল সিন্টেং রাজাদেরই অধীন।

সিন্টেং রাজাদের পূর্ববর্তী এক হাজার বছর জৈন্তিয়া সমতল তথা বৃহত্তর সিলেট কোন একক রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়নি। এই অঞ্চল বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাঙ্গন হয় ৬০০ সাল থেকে ৬৫০ সালের মধ্যবর্তী কোন

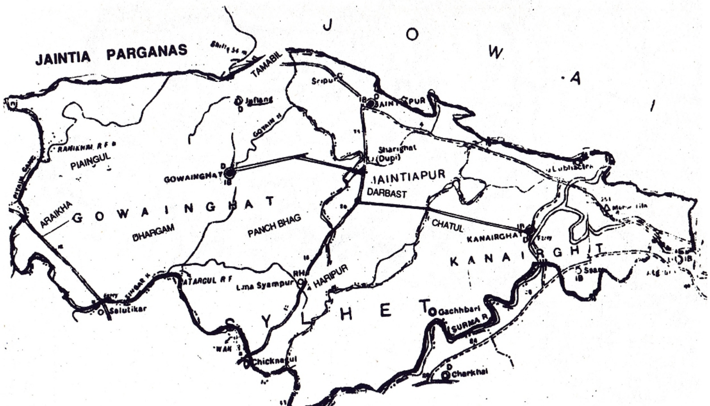
এক সময়ে। অখণ্ড নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়া ভেঙ্গে তখন লাউড় ও গৌড় নামে দুটি পৃথক রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্য সিলেট ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত আর পশ্চিম সিলেট ছিল লাউড়ের অন্তর্ভুক্ত। জৈন্তিয়া রাজ্য তখন উত্তর সিলেটের সমতল ভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে রাজ্যটির আয়তন আর বাড়েনি, বরং এর আয়তন আরও কমেছে। উত্তর সিলেটের জৈন্তিয়া সমতল ভূমিতে একসময় কিছু স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ১০০০ সাল থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে জৈন্তিয়ার বিভিন্ন এলাকা স্বাধীন সিন্টেং সরদারদের হাতে শাসিত হয়েছে। ১৫০০ সালের আগে জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর ছিল সিন্টেং সরদারদের অধীনে তিনটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য। এগুলোর মধ্যে জাফলং ছিল আকারে সবচেয়ে বড়। এই রাজ্যটি 'মালনিয়াং' রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল।

ওই সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্য মূলত জয়ন্তাপুরী রাজ বা পরগনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রাজ্যটির সীমানা সংকোচনের সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল এটিই। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর প্রধান সরদার বা সিয়েমের হস্তগত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ রাজ্যটির সীমানা বাড়িয়েছিলেন। সিন্টেং রাজবংশের প্রথমদিকের রাজা বিজয় মাণিক জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর রাজ্যকে নিজের শাসানাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও তিনি চতুল, খরিল, আড়াইখা, চাউরা ও পাঁচভাগ অঞ্চলেও জৈন্তিয়ার 'রাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর রাজাদের শাসনামলে জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রদেশগুলোকে বলা হতো 'রাজ'। আকৃতির বিচারে এগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এগুলো প্রদেশের মতোই ছিল। জৈন্তিয়া সমতলে এমন ১৮টি রাজের অস্তিত্ব ছিল।

তবে এগুলো সমমর্যাদাসম্পন্ন বা সমগুরুত্বসম্পন্ন ছিল না। মূলত দশটি রাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাকিগুলো এগুলোর অধীনেই ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দশটি রাজ আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা- খেলুরাজ ও হাজারকি রাজ। খেলুরাজের সংখ্যা ছিল চার। এগুলো হল- জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং রাজ, চারিকাটা রাজ ও ফালজুর রাজ। জৈন্তিয়া সমভূমির সবচেয়ে প্রাচীন জনপদসমূহ ছিল এই চারটি খেলুরাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন জনপদসমূহ ছিল ছয়টি হাজারকি রাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হল- ধরগাম রাজ, চতুল রাজ, খরিল রাজ, পাঁচভাগ রাজ, আড়াইখা রাজ ও চাউরা রাজ। খেলুরাজ ও হাজারকি রাজগুলোতে সিন্টেং রাজবংশের উদ্ভবের আগে

থেকেই জনবসতি ছিল। সিন্টেং রাজাদের শাসনামলে জৈন্তিয়ার কিছু নিম্নভূমি বা হাওর এলাকা পলিমাটি দ্বারা ভরাট হয়ে জনবসতিতে রূপান্তরিত হয়।

রাজারা এসব জনপদকে বিভিন্ন হাজারকি রাজের অধীনে 'জুলাই রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এসব জুলাই রাজের সংখ্যা ছিল আট। এর মধ্যে সাতটির অবস্থান বর্তমান কানাইঘাট উপজেলায় এবং একটির অবস্থান কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায়। এগুলোর নাম হচ্ছে- মুলাগুল রাজ, সাতবাক রাজ, বাজেরাজ, পশ্চিমভাগ রাজ, বড়দেশ রাজ, বাউরভাগ রাজ, বর্ণফৌদ রাজ ও পিয়াইনগুল রাজ। এসব রাজের কোন প্রতিনিধি সরাসরি জৈন্তিয়ার রাজদরবারে অংশ নিতেন না। যেসব হাজারকি রাজের অধীনে এগুলো পরিচালিত হতো সেসব হাজারকি রাজের প্রধানরাই রাজদরবারে এগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতেন।



চিত্র: জৈন্তিয়া সমভূমির ১৮ রাজ (বর্তমান সিলেট জেলার একাংশ)

জৈন্তিয়া রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী মোট বাইশ জন 'রাজ-প্রতিনিধি' দরবারে অংশ নিতে পারতেন; সমতল থেকে অংশ নিতেন দশ জন (খেলুরাজ ও হাজারকি রাজের প্রতিনিধি) আর পার্বত্য অঞ্চল থেকে অংশ নিতেন বারো জন (পুঞ্জি বা এলাকা রাজের প্রতিনিধি)। ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়ায় ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে 'রাজ-ব্যবস্থা' বিলুপ্তি লাভ করে। ব্রিটিশরা এখানকার ১৮ রাজকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের আওতাধীন ১৮ পরগনায় রূপান্তরিত করে। ১৮৫৬ সালের চতুর্থ বন্দোবস্তের সময় পশ্চিমভাগ পরগনাটিকে বাজেরাজের

সাথে যুক্ত করা হলে জৈন্তিয়ার পরগনার সংখ্যা হয়ে যায় ১৭।[1] তখন থেকে জৈন্তিয়া সমভূমি 'জৈন্তিয়া ১৭ পরগনা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আমলে 'পরগনা-ব্যবস্থা' বিলুপ্ত হলেও এখনও 'জৈন্তিয়া ১৭ পরগনা' নামটি বেশ প্রসিদ্ধ।

জৈন্তিয়া সমতলে যখন সিন্টেং রাজাদের শাসন শুরু হয় তখন জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা ১২ জন সরদারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এসব সরদারের উপাধি ছিল 'দলই'। দলইয়ের নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে বলা হতো 'পুঞ্জি' বা 'এলাকা' (এলাকা একটি প্নার শব্দ)। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর লোকজন ১২টি পুঞ্জি বা এলাকায় বিভক্ত হয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ে বসবাস করতো। এই ১২টি পুঞ্জিকে একত্রে বলা হতো 'হিমা'। দলইদের মধ্যে একজনকে হিমার প্রধান নির্বাচিত করা হতো। তাঁর উপাধি ছিল 'সিয়েম'। সিয়েমের অধীনে বাকি দলইরা ঐক্যবদ্ধ থাকতেন। সাধারণত সুতংগা পুঞ্জির দলইকে হিমার সিয়েম নির্বাচিত করা হতো। জৈন্তিয়া সমতলের প্রথম সিন্টেং রাজা ছিলেন এই সুতংগা পুঞ্জিরই দলই ও সিয়েম।

তাঁর পরবর্তী রাজারাও 'সিয়েম সুতংগা' উপাধির অধিকারী ছিলেন। তবে তারা সুতংগায় বসবাস করতেন না; তারা জয়ন্তীপুরে বসবাস করতেন। তাই সুতংগা পুঞ্জিটিকে পরিচালনার জন্য তারা অন্য কাউকে দলই নিযুক্ত করতেন বলে ধারণা করা হয়। জৈন্তিয়ার রাজদরবারের সভ্য হিসেবে হিমা থেকে ১২ জন দলই অংশ নিতেন (১১ জন নয়)। যে ১২টি পুঞ্জি বা এলাকা থেকে দলইরা রাজদরবারে অংশ নিতেন সেগুলোর নাম নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক রাভি পুভাইয়ার মতে, জৈন্তিয়া রাজ্যের ১২টি এলাকার নাম হল- Sutnga, Nartiang, Nongtalang, Nangphyllut, Nongjngi, Nangbah, Lakadong, Shangpung, Mynso, Jowai, Raliang, Amwi. সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, জৈন্তিয়া রাজ্যের ১২টি এলাকার নাম হল-

[1] ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের চতুর্থ বন্দোবস্তের সময় ইংরেজরা পশ্চিমভাগ পরগনাকে বাজেরাজ পরগনার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। ফলে ইংরেজ-শাসিত জৈন্তিয়া সমতলের মোট পরগনার সংখ্যা ১৮টি থেকে হয়ে যায় ১৭টি। বিলুপ্তির আগে পশ্চিমভাগ পরগনাটি যে ৫টি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল, সেগুলো হলো ছোটদেশ, চটিগ্রাম, ভাটিদিহি, উমাগড় ও বাটইয়াইল। এ মৌজাগুলোর নাম আজও টিকে আছে। বর্তমানে এগুলো কানাইঘাট উপজেলার প্রসিদ্ধ কিছু গ্রাম।

Suhtnga, Nartiang, Natelag, Norpu, Nongjhini, Nongbare, Lakhdong, Shangpung, Myuso, Jawai, Raliang, Rambhai.



চিত্র: জৈন্তিয়া পাহাড়ের ১২ রাজ (বর্তমান মেঘালয়ের একাংশ)

জৈন্তিয়ার মূল ৩০টি রাজের (১৮ রাজ + ১২ রাজ) বাইরে রাজ্যটির কিছু অধীনস্থ অঞ্চলও ছিল। এসব অঞ্চলে সিন্টেং রাজাদের কোন স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ছিল না; নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ছিল সাময়িক। এরকম মোট ছয়টি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি অঞ্চল ছিল মোগলানের; বাকি চারটি অঞ্চল ছিল জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যবর্তী সরদারশাসিত অঞ্চল। মোগলানের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার নায়েবে ফৌজদার দুর্লভ দাস জৈন্তিয়ার কিছু ভূমি দখল করেছিলেন। এ ঘটনার জের ধরে জৈন্তিয়াপতি জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণে আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং পরগনাটিকে দখল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মোগলানের চারখাই পরগনাটিকেও দখল করেছিলেন। চারখাই দখলের কারণ ছিল ধর্মীয়। সেখানকার সেনগ্রামের হাটকেশ্বর শিবমন্দিকে নিজ রাজ্যভুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি পরগনাটিকে দখল করে নিয়েছিলেন। উভয় পরগনা দখলের আনুমানিক সময়কাল হচ্ছে ১৭১৯ সাল। আনুমানিকভাবে, ১৭৪০ সাল পর্যন্ত পরগনাদ্বয় জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল।

আনুমানিক ১৬০৩ সালে জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের মধ্যবর্তী ডিমারুয়াকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের পরে এর নিয়ন্ত্রণ কাছাড়িদের হাতেই ছিল। পরে তা জৈন্তিয়ার হাতে আসে। আরও পরে তা আহোমদের হাতে চলে যায়। তবে কেউই এই অঞ্চলকে সরাসরি নিজস্ব প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেননি। এটি একটি অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। এমন আরেকটি সামন্ত রাজ্য ছিল গোভা। এটি কখনো জৈন্তিয়ার দ্বারা আবার কখনও আহোমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এটি মূলত জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যবর্তী একটি স্বায়ত্বশাসিত 'বাফার এলাকা' হিসেবে কাজ করতো। জৈন্তিয়ার পার্বত্য পথ অতিক্রম করে আহোমে যেতে হলে এর ভেতর দিয়েই যেতে হতো। কুফানলী এবং কাওবান নামে আরও দুটো অঞ্চলের কথা জানা যায় যেগুলো একসময় জৈন্তিয়ার অধীনস্থ অঞ্চল ছিল। জৈন্তিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হওয়ার পর এগুলো আহোমের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

জৈন্তিয়া সমতলের ১৮ রাজ ও এগুলোর বর্তমান অবস্থান --- খেলুরাজ (১-৪) হাজারকি রাজ (৫-১০) জুলাই রাজ (১১-১৮)	জৈন্তিয়া পাহাড়ের ১২ রাজ (পুঞ্জি বা এলাকা) তথ্যসূত্র: *Ka History ka Ri Jaintia ha shwa ki Phareng,* End News, Khliehriat, 26 August 2023	জৈন্তিয়ার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ (অস্থায়ী)
১) জয়ন্তাপুরী রাজ (জৈন্তাপুর) ২) জাফলং (গোয়াইনঘাট) ৩) চারিকাটা (জৈন্তাপুর) ৪) ফালজুর (কানাইঘাট) ৫) ধরগাম (গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ) ৬) চতুল (কানাইঘাট) ৭) খরিল (জৈন্তাপুর) ৮) পাঁচভাগ (গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর)	1) Sutnga 2) Nartiang 3) Nongtalang 4) Nangphyllut 5) Nongjngi 6) Nangbah 7) Lakadong 8) Shangpung 9) Mynso 10) Jowai 11) Raliang	১) ডিমারুয়া ২) গোভা ৩) কাওবান ৪) কুফানলী ৫) ঢাকাদক্ষিণ ৬) চারখাই

৯) আড়াইখা (গোয়াইনঘাট) ১০) চাউরা (কানাইঘাট) ১১) মুলাগুল (কানাইঘাট) ১২) সাতবাক (কানাইঘাট) ১৩) বাজেরাজ (কানাইঘাট) ১৪) পশ্চিমভাগ (কানাইঘাট) ১৫) বড়দেশ (কানাইঘাট) ১৬) বাউরভাগ (কানাইঘাট) ১৭) বর্ণফৌদ (কানাইঘাট) ১৮) পিয়াইনগুল (কোম্পানিগঞ্জ)	12) Amwi	

অধ্যায় চার
সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর কথা

পুরাতত্ত্ববিদ রাজমোহন নাথের মতে, জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসী সিন্টেংরা আদি সিন (Tsin) বংশের লোক। তাদের আদি বাসভূমির নাম ছিল টেইং (Teing)। Tsin ও Teing শব্দটি মিলে Tsinteing বা Synteng শব্দটির উদ্ভব। আর সেখান থেকেই এসেছে 'জৈন্তিয়া', 'জয়ন্তীয়া' বা 'জৈন্তা' শব্দটি। সুদূর অতীতে জৈন্তিয়া পাহাড়ে সিন্টেংদের বসতি ছিল অল্প এবং তাদের সমাজটাও ছিল বেশ সরল। প্রতিটি বসতি একেকজন সিন্টেং প্রধানের অধীনে পরিচালিত হতো। এসব বসতি প্রধানকে বলা হতো 'লাংদহ'। একজন লাংদহ একাধারে ধর্মযাজক, বিচারক এবং প্রশাসকের ভূমিকা পালন করতেন। তাকে বসতির সবাই মেনে চলতো এবং পছন্দ করতো। বসতিগুলো পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ায় লাংদহদের ওপরে আর কারও কর্তৃত্ব ছিল না। কালক্রমে সিন্টেং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সমাজব্যবস্থাও বদলে যেতে থাকে।



চিত্র: সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর শিশু

বিভিন্ন গোষ্ঠীর (প্নার ভাষায় এসব গোষ্ঠী বা ক্ল্যানকে 'কুর' বলা হতো) সিন্টেং পরিবারসমূহের সমন্বয়ে বড় বড় 'ক্লং' নামক বসতি গড়ে উঠতে থাকে। এসব বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সিন্টেংরা আরও বড় সামাজিক সংগঠনের জন্ম দেয়। এর নাম 'রাইদ'। কয়েকটি ক্লং মিলে একটি রাইদ গঠন হতো। আবার

কয়েকটি রাইদ মিলে গঠন হতো একটি ‘এলাকা’। বাংলা ভাষায় এলাকা বোঝাতে পুঞ্জি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সিন্টেংদের এলাকা বা পুঞ্জি ছিল মোট ১২টি। একেকটি পুঞ্জির প্রধান বা সরদারকে বলা হতো ‘দলই’। সিন্টেং সমাজে দলইরা ছিলেন খুবই প্রভাবশালী। পুরো সিন্টেং সমাজকে মাত্র ১২ জন দলই নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের ওপরে আর কারও কোন কর্তৃত্ব ছিল না। সিন্টেং সমাজকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই দলইরা নিজেদের মধ্যে একজনকে প্রধান দলই হিসেবে সাব্যস্ত করতেন। তাঁর উপাধী ছিল ‘সিয়েম’। সিয়েমের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ১২টি পুঞ্জিকে বলা হতো ‘হিমা’। সাধারণত সুতংগা পুঞ্জির দলইকে হিমার সিয়েম নির্বাচিত করা হতো।



চিত্র: সিন্টেংদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সুতংগা পুঞ্জির দলই তথা হিমার সিয়েমের হাতে জৈন্তিয়া সমভূমির কর্তৃত্ব চলে আসে। এই সিয়েমের নাম ছিল মানগোসাঁই বা বড়গোসাঁই। ঘটনাচক্রে তিনি সমতলের রাজা হয়েছিলেন এবং সেখানে একটি নতুন রাজবংশের (সিন্টেং রাজবংশ) সূচনা করেছিলেন। হিমার

সিয়েম আর সমতলের রাজা একই ব্যক্তি হওয়ায় তখন থেকে জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমভূমির মধ্যে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য সিন্টেং রাজবংশের প্রথমদিকের রাজারা সিন্টেংদের কাছে শুধুমাত্র হিমার সিয়েম হিসেবেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন; সিন্টেংরা তাদেরকে 'রাজা' মনে করতো না। খুব সম্ভবত রাজা যশোমাণিকের সময় থেকে সিন্টেং দলইরা রাজদরবারে অংশ নিতে শুরু করেন। তখন থেকে হিমার সিয়েম সিন্টেংদের কাছে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। দলইরা সিয়েমকে রাজা হিসেবে মেনে নেওয়ায় ১২টি পার্বত্য পুঞ্জি বা এলাকা জৈন্তিয়ার 'রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

হিমার এলাকাসমূহ জৈন্তিয়ার রাজ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও এগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল। সিন্টেং দলইরা স্বাধীন সরদার হিসেবেই নিজেদের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের নিজস্ব অর্থবল এবং লোকবল ছিল। তাঁরা শুধু মৌখিকভাবেই রাজার আনুগত্য করতেন এবং রাজ্যের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাজাকে সহায়তা করতেন। তারা রাজাকে কোনো কর দিতেন না; রাজার প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিবছর একটি করে বলির পাঠা উপহার দিতেন। প্রতিবছর শারদীয় উৎসবের সময় ১২টি এলাকা থেকে রাজার কাছে ১২টি বলির পাঁঠা পৌঁছানো হতো। এই প্রতীকী আনুগত্যের তাৎপর্য ছিল অনেক গভীর। রাজাকে বহিরাগত শক্তির হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে সিন্টেং দলইগণই মূল ভূমিকা পালন করতেন। তাদের কারণেই কোন বহিরাগত শক্তির পক্ষে জৈন্তিয়া দখল করা সম্ভব হতো না। বর্তমান ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড় ও পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যে তাদের এলাকসমূহ বিস্তৃত ছিল। এলাকাসমূহের তালিকা নিম্নরূপ (একাধিক সূত্র থেকে সংগৃহীত তালিকাসমূহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে)।

জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের তালিকা	অধ্যাপক রাভি পুভাইয়া কর্তৃক প্রণীত তালিকা তথ্যসূত্র: *Ka History ka Ri Jaintia ha shwa ki Phareng,* End News, Khliehriat, 26 August 2023	*হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর তালিকা
সুতংগা	Sutnga	Suhtnga

নারতিয়াং	Nartiang	Nartiang
নাথেলাং	Nongtalang	Natelang
নারপুহ	Nangphyllut	Norpuh
নংজিনি	Nongjngi	Nongjhini
নংবারেহ	Nangbah	Nongbare
লখডং	Lakadong	Lakhdong
সাংপুং	Shangpung	Shangpung
ময়সু	Mynso	Myuso
জোয়াই	Jowai	Jawai
রাম্ভাই	Raliang	Raliang
গোভা	Amwi	Rambhai

অধ্যায় পাঁচ

জৈন্তিয়ার সকল রাজা-রানীর বিবরণ

(আসিফ আযহার কর্তৃক প্রণীত তালিকা)

নারী শাসকদের যুগ (মহাভারতের যুগ – ৫৫০ সাল)

১) মহারানী জয়ন্তী: প্রাক-পৌরাণিক যুগে উত্তর সিলেট ও পূর্ব মেঘালয়ে বসবাসরত মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর নারী সরদার ছিলেন জয়ন্তী। নিজ জনগোষ্ঠীর নারী যোদ্ধাদেরকে নিয়ে তিনি সিলেট সমতল ও মেঘালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। জয়ন্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই নারী শাসিত রাজ্যটি পৌরাণিক যুগে 'জয়ন্তী রাজ্য' নামে পরিচিতি লাভ করে।

২) মহারানী প্রমীলা: জৈমিনি মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে নারী রাজ্য জয়ন্তীর অধিশ্বরী ছিলেন মহারানী প্রমীলা। তিনি যজ্ঞের ঘোড়া আটক করেছিলেন এবং তাঁর নারী যোদ্ধাদেরকে নিয়ে মহাবীর অর্জুনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩) মহারানী উর্মি: হট্টনাথের পাঁচালীর বর্ণনা এবং ঐতিহাসিকদের অনুমান অনুযায়ী, ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে কামরূপের কোন একটি খণ্ডরাজ্যের রাজা ছিলেন কামসিন্ধু। তাঁর মৃত্যুর পর একজন প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্যটি কেঁড়ে নেন। নিরুপায় হয়ে কামসিন্ধুর পত্নী রানি উর্মি তাঁর লোকজন নিয়ে রাজ্যের পশ্চিমদিকে চলে যান। সেখানকার নারী রাজ্যটি দখল করে তিনি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর কন্যা উর্বরার বিয়ে হয় তিব্বতের যুবরাজ কৃষকের সাথে। কৃষক ও উর্বরার পুত্রসন্তানের নাম ছিল হাটক।

কৃষক রাজবংশ (৬০০ – ১২৫০ সাল)

[কৃষক রাজবংশের শুরুর দিকে লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া পাহাড়- এই তিনটি অঞ্চল জৈন্তিয়া রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। রাজা জয়ন্তকের সময় থেকে উত্তর সিলেটের সমতলভূমির মধ্যেই জৈন্তিয়া রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল]

৪) রাজা হাটক: হাটক বড় হয়ে তাঁর মাতামহীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। এতে জৈন্তিয়া রাজ্যের দীর্ঘদিনের নারী শাসনের অবসান ঘটে এবং পুরুষ রাজবংশের সূচনা হয়। হাটকের পিতার নামানুসারে এই

রাজবংশটিকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'কৃষক রাজবংশ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। আনুমানিকভাবে ১২৫০ সাল পর্যন্ত এই রাজবংশের রাজারা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। তবে এসব রাজাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অল্প কয়েকজন রাজা সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

৫) রাজা গুহক: হাটকের পরে তাঁর পুত্র গুহক জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। আনুমানিকভাবে ৬০০ সালের পরবর্তী কয়েক দশক ধরে তিনি জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। তাঁর আমলে জৈন্তিয়া সমতলের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ, মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশ, সুনামগঞ্জ জেলার সম্পূর্ণ অংশ এবং হবিগঞ্জ জেলার উত্তরাংশ রাজা গুহকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে জৈন্তিয়া রাজ্য ভেঙ্গে লাউড় ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৬) জয়ন্তক: রাজা গুহকের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জৈন্তিয়া রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। তাঁর পুত্র জয়ন্তক ছিলেন জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ডের শাসক। অপর দুই পুত্র ছিলেন লাউড় ও গৌড়ের শাসক। জৈন্তিয়া পাহাড়ের মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর ওপর রাজা জয়ন্তকের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই জনগোষ্ঠীর লোকজন কৃষক রাজবংশের রাজাদের আনুগত্য করতো না (নিজেদের জনগোষ্ঠীর রাজা না হওয়ায়)। তাই প্রকৃত অর্থে রাজা জয়ন্তকের আমলে আগের জৈন্তিয়া রাজ্যটি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জয়ন্তক আনুমানিকভাবে ৬৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পরবর্তী কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গেলেও তাদের শাসনকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

৭) মহাবল: জয়ন্তকের পরের রাজার নাম মহাবল।

৮) বানছারু: মহাবলের পরের রাজার নাম বানছারু।

৯) রংবীর: বানছারুর পরের রাজার নাম রংবীর।

১০) ভীমবল: রংবীরের পরের রাজার নাম ভীমবল।

১১) জয়মল্ল: তাঁর সময়কাল জানা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি একজন মল্লবিদ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একটি হাতিকে তাঁর বুকে পাঁ রাখতে দিয়েছিলেন; তবুও তাঁর কিছুই হয়নি। কিন্তু একটি গন্ডারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন।

১২) বানচুড়দেবঃ বানচুড়দেব একজন কৃষিপ্রেমিক রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রচুর বৃক্ষরোপণ হয়। এতে রাজ্যজুড়ে মধু, তেঁজপাতা, কমলা ও আগরের ফলন বেড়ে যায়। তাঁর সময়ে জৈন্তিয়ায় বৌদ্ধ বণিকদের আগমন ঘটেছিল। এই বণিকরা নৌ-পথে শিলাহাট হয়ে জৈন্তিয়ায় এসেছিলন। তারা জৈন্তিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা বানচুড়দেব বৌদ্ধধর্মের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

১৩) কামদেবঃ কৃষক রাজবংশের শেষের দিকের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন রাজা কামদেব। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। কামদেবের শাসনামলকে কৃষক রাজবংশের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ধরা হয়। যতদূর জানা যায়, রাজা কামদেব সংস্কৃতচর্চায় খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে মালব দেশের রাজধানী ধারানগর থেকে বিখ্যাত এক পণ্ডিত ও কবি জৈন্তিয়ায় আসেন। তাঁর নাম ছিল কবিরাজ। *রাঘব পান্ডবীয়* গ্রন্থ রচনার জন্য এই কবি বেশ বিখ্যাত। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকেই রাজা কামদেবের কথা জানা যায়।

১৪) ভীমবলদেবঃ কামদেবের পর তাঁর ছেলে ভীমবলদেব রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু ভীমবলদেব ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। পার্বত্য গোত্রনেতারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, ভীমবলদেব একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হয় নিহত হয়েছিলেন অথবা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কৃষক রাজবংশের শেষ রাজা তিনিই। আনুমানিকভাবে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন।

পুরোহিত রাজবংশ (১২৫০ – ১৫০০ সাল)

[পুরোহিত রাজবংশের শাসনামলে জৈন্তিয়া রাজ্য বেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর অঞ্চলত্রয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সরদারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। জৈন্তিয়া রাজ্য তখন কেবল জয়ন্তাপুরী রাজ বা পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।]

১৫) কেদারেশ্বর রায়ঃ এই রাজার নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না।

১৬) ধনেশ্বর রায়ঃ এই রাজার নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না।

১৭) কন্দর্প রায়ঃ এই রাজার নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না।

১৮) জয়ন্ত রায়ঃ জয়ন্ত রায় ছিলেন পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের (১৪৫০ – ১৫০০ সাল) কিছু সময় তিনি জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। তাঁর আমলে জৈন্তিয়া রাজ্যটি কেবলমাত্র জয়ন্তাপুরী রাজ বা পরগনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমেয়। জয়ন্তাপুরী রাজের পার্শ্ববর্তী জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর অঞ্চলে তখন স্বাধীন পাহাড়ি সরদারদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (জৈন্তিয়ার অন্যান্য অংশে তখন জনবসতি ছিল না বললেই চলে। তাই সেসব অঞ্চলকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতো না।) কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর খণ্ডরাজ্যের শাসকরা ছিলেন রাজা জয়ন্ত রায়ের পুত্রসন্তান। এই দাবির সত্যতা যাচাইয়ের কোন উপায় নেই।

১৯) জয়ন্তী দেবীঃ জয়ন্তী দেবী ছিলেন রাজা জয়ন্ত রায়ের কন্যা; পিতার মৃত্যুর পর তিনিই জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। তাকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, পাহাড়ি সরদার লম্ভবরের পুত্র বড়গোসাঁই বা মানগোসাঁইকে তিনি পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। জয়ন্তী দেবীর পরে এই বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, জয়ন্তী দেবী জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর অঞ্চলত্রয়কে নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন (অঞ্চলত্রয়ের রাজাদেরকে হত্যা করে)।

সিন্টেং রাজবংশ (১৫০০ – ১৮৩৫ সাল)

২০) বড়গোসাঁই বা মানগোসাঁইঃ জয়ন্তী দেবীর পরে বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার ক্ষমতা লাভ করেন। একইসাথে তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে পাহাড়েরও সরদার হয়েছিলেন। জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতল এভাবে আবারও এক অভিন্ন শাসনের আওতায় চলে আসে। জৈন্তিয়া সমতলের রাজা আর জৈন্তিয়া পাহাড়ের সরদার বা সিয়েম একই ব্যক্তি হওয়ায় নারীশাসনের যুগের এক হাজার বছর পরে আবারও পাহাড় ও সমতল মিলে এক শক্তিশালী রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই নতুন রাজবংশটির নাম সিন্টেং বা জৈন্তিয়া রাজবংশ (যেহেতু বড়গোসাঁই ছিলেন পার্বত্য সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর সদস্য)।

২১) পর্বত রায় / বুড়া পর্বত রায়ঃ এই রাজা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

২২) বড়গোসাঁইঃ জৈন্তিয়ার ইতিহাসে এই রাজা ‘প্রথম বড়গোসাঁই’ নামে পরিচিত। সিন্টেং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বড়গোসাঁইকে ঐতিহাসিকরা

'মানগোসাঁই', 'মাঝগোসাঁই' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন; ইতিহাসে তাঁর 'বড়গোসাঁই' নামটি আলোচিত হয়নি। তাই জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'প্রথম বড়গোসাঁই' ও 'দ্বিতীয় বড়গোসাঁই' হিসেবে অন্য দুজন স্বীকৃত হয়েছেন। প্রথম বড়গোসাঁইয়ের আমলে জৈন্তিয়ার বামজঙ্ঘা মহাপীঠ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে নরবলি দেওয়া হতো। জৈন্তিয়ার রাজা যেসব অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন, প্রতি বছর এমন একজন অপরাধীকে বামজঙ্ঘা মহাপীঠে বলি দেওয়া হতো। ব্রিটিশ আমলে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

২৩) বিজয় মাণিক (? – ১৫৬৪ সাল): রাজা প্রথম বড়গোসাঁইয়ের পরে জৈন্তিয়ার সিংহাসন লাভ করেন রাজা বিজয় মাণিক। বিজয় মাণিক হলেন জৈন্তিয়ার প্রথম সিন্টেং রাজা যার কথা জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাসে পাওয়া যায়। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জৈন্তিয়াপতি বিজয় মাণিক তাঁর সমসাময়িক ত্রিপুরাধিপতির সাথে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর খণ্ডরাজ্যত্রয়কে জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন রাজা বিজয় মাণিক। এছাড়াও তিনি চতুল, খরিল, আড়াইখা, চাউরা ও পাঁচভাগ রাজসমূহকেও জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কোচ রাজাদের ইতিহাসের দলিল 'বংশাবলি'-র বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৫৬৪ সালে কামতা রাজ্যের সেনাপতি চিলারায় জৈন্তিয়ায় আক্রমণ করেছিলেন। চিলারায়ের ৪০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াই করে বিজয় মাণিক বীরের মতোই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

২৪) প্রতাপ রায় / প্রতাপ নারায়ণ (১৫৬৪ সাল – ১৫৯৬ সাল): বিজয় মাণিকের মৃত্যুর পর কামতা রাজ্যের বিজয়ী সেনাবাহিনী তাঁর উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসার সুযোগ দেয়। দুর্গম জৈন্তিয়া রাজ্যকে স্থায়ীভাবে দখল করা সম্ভব নয় ভেবে বিজয়ীরা বেশ কিছু অর্থকড়ি ও উপহার নিয়ে জৈন্তিয়া ছেড়ে চলে যায়। নতুন রাজা প্রতাপ রায় বা প্রতাপ নারায়ণ তাদেরকে ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা ১০০টি ঘোড়া এবং ১০০টি খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি কোচ রাজাকে প্রতি বছর ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা, ৭০টি ঘোড়া এবং ৩০০টি নকাইদাও (একটি বিশেষ ধরণের ছুরি) দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতিটি আদৌ রক্ষিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এর কারণ, কোচদের আধিপত্য বেশিদিন বজায় থাকেনি। তাদের রাজ্যটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল।

২৫) ধনমাণিক (১৫৯৬ সাল – ১৬০৫ সাল): ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিকের সময়কাল ছিল ১৫৯৬ সাল থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত। এই সময়কার সবচেয়ে বড় ঘটনা হল জৈন্তিয়া-কাছাড়ি যুদ্ধের ঘটনা। আনুমানিক ১৬০৩ সালে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। স্যার এডওয়ার্ড গেইট লিখেছেন, জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য ডিমারুয়াকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

২৬) যশোমাণিক (১৬০৫ সাল – ১৬৪১ সাল): ধনমাণিকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগিনেয় যশোমাণিক জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজা। তাঁর আমলে প্রতিবেশীদের সাথে জৈন্তিয়ার সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ। কথিত আছে, কোচবিহারের রাজকন্যাকে বিবাহের পর যশোমাণিক একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সময় পর্যন্ত সিন্টেং রাজপরিবারে সনাতন ও নিয়েমত্রে- উভয় ধর্মেরই চর্চা হতো বলে ধারণা করা হয়। যশোমাণিকই প্রথম পুরোপুরিভাবে হিন্দু ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর আমলে সিলেটের পাঠান শাসকরা মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের পরিবার-পরিজন ও বংশধররা জৈন্তিয়ায় একটি মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে তোলেছিলেন।

২৭) সুন্দর রায় (১৬৪১ সাল – ?): এই রাজার শাসনকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না।

২৮) ছোট পর্বত রায় (? – ১৬৪৮ সাল): এই রাজার শাসনকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না।

২৯) যশোমন্ত রায় (১৬৪৮ সাল – ১৬৬৮ সাল): যশোমন্ত রায় জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজা। তাঁর আমলে আহোম রাজ্যের সাথে জৈন্তিয়ার অনেকগুলো পত্র বিনিময় হয়েছিল। এসব পত্র আহোমের ইতিহাস বা বুরুঞ্জীতে সংরক্ষিত হয়েছে। আহোমের ইতিহাসে এই রাজা খুবই প্রাসঙ্গিক। যশোমন্ত রায় জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পর আহোমরাজ সুতিংফা তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এতে উভয় রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। এর কয়েক বছর পরে উভয় রাজ্যের মধ্যে আবারও

সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের সময়কাল পর্যন্ত এই সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

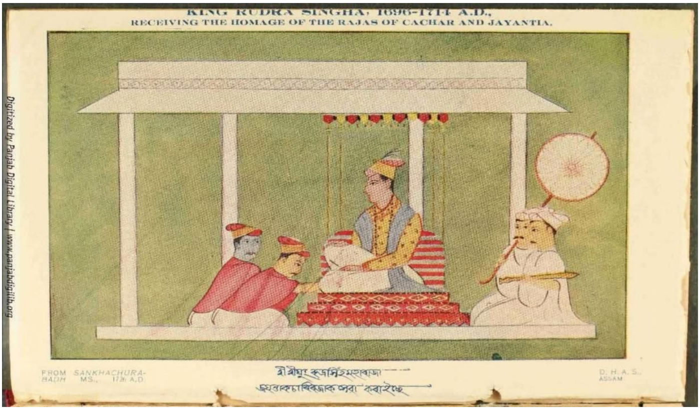
৩০) প্রমথ রায় বা মানসিংহ (১৬৬৮ সাল – ১৬৬৯ সাল): যশোমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর নাতি প্রমথ রায়। প্রমথ রায় নিজের নাম পাল্টে 'মানসিংহ' নামে সিংহাসনে বসেছিলেন। সিংহাসনে আরোহনের মাত্র ছয় মাসের মাথায় মানসিংহ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাকে হত্যা করে জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রতাপ সিংহ।

৩১) প্রতাপ সিংহ (১৬৬৯ সাল – ১৬৬৯ সাল): প্রতাপ সিংহ কে ছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় যে, তিনি বাংলা থেকে জৈন্তিয়ায় ফিরে এসেছিলেন এবং রাজা মানসিংহকে সরিয়ে নিজে রাজা হয়েছিলেন। প্রতাপ সিংহ সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের কোন আত্মীয় ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি মোগলানে (সিলেটে) নির্বাসিত ছিলেন। ১৬৬৯ সালে তিনি মানসিংহকে সরিয়ে জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন।

৩২) লক্ষ্মীনারায়ণ / লক্ষ্মী সিংহ (১৬৬৯ সাল – ১৭০১): প্রতাপ সিংহকে হত্যা করে জৈন্তিয়ার সিংহাসন দখল করেন লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মী সিংহ। এই ঘটনা ১৬৬৯ সালের (এই বছরটিতে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে তিনজন রাজা বসেছিলেন)। লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষমতায় এসেই আহোমদের কাছ থেকে ডিমারুয়া ফেরত দাবি করেন। কিন্তু আহোমরা তা ফেরত দেয়নি। আহোমদের সাথে জৈন্তিয়ার সম্পর্ক তখন থেকে দুর্বল হতে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণ রাজধানী জয়ন্তীপুরের অনেক উন্নয়ন করেছিলেন। জয়ন্তীপুরকে ৫২ হাটিতে ভাগ করেছিলেন তিনিই। বড়দেউল সম্ভবত তাঁর হাতেই তৈরী। ১৬৮২ সালে তিনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে সিলেট শহর দখল করেছিলেন। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন তখনকার সুবে বাংলার মোগল সুবাদার। তাঁর পুত্র ইরাদত খাঁ লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ থেকে সিলেট শহর পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এরপর মোগলদের সাথে লক্ষ্মীনারায়ণের আর কোন বিরোধ হয়নি।

৩৩) রামসিংহ (১৭০১ সাল – ১৭০৮ সাল): ১৭০১ সালে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় রামসিংহ। এই রাজা জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'প্রথম রামসিংহ' নামে পরিচিত। তিনি ১৭০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। অতিদীর্ঘ না হলেও তাঁর সময়কাল জৈন্তিয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, জৈন্তিয়া-আহোম

যুদ্ধের ঘটনা। উভয় রাজ্যের ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৭০৭ ও ১৭০৮ সালে। ১৭০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার নির্দেশে আহোমের বড়বড়ুয়ার নেতৃত্বে ৪৩,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী কপিলি উপত্যকা ধরে কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। বড়ফুকনের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী উত্তর দিক থেকে গোভা হয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করে। দারাং এর রাজাও একদল সৈন্য নিয়ে এদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকনের বাহিনীদ্বয় ১৭০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জৈন্তিয়া বিজয় সম্পন্ন করেছিল। জৈন্তিয়াপতি রামসিংহ তাদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। তাকে আহোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আহোমরাজ ঘোষণা দিলেন যে, জৈন্তিয়া রাজ্যকে আহোমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ঘোষণার পর জৈন্তিয়ার দলই বা সরদাররা প্রতিবেশী খাসিয়াদের সহায়তায় এক ভয়ংকর প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। এর ফলে আহোম সেনাপতি বড় বড়ুয়া ও বড়ফুকন জৈন্তিয়া ছেড়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিরে যাওয়ার পূর্বে তারা জয়ন্তীপুর এবং এর চারপাশের গ্রামগুলোকে ধ্বংস করেন।



চিত্র: আহোম রাজ্যের রাজকীয় নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত একটি ঐতিহাসিক ছবি। ছবিতে আহোমরাজ রুদ্র সিংহকে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। তাঁর সামনে বসে আছেন জৈন্তিয়ার রাজা প্রথম রামসিংহ ও কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণ। আসামের গুয়াহাটিতে ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব বিভাগে (DHAS) এই ছবিটি সংরক্ষিত আছে।

জৈন্তিয়াবাসীদের প্রতিরোধ যুদ্ধে আহোমদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের ২৩৬৬ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে ১২ জন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাও ছিলেন। তাদের প্রতিপক্ষ দলের এতো যোদ্ধা নিহত হয়নি। তবে জৈন্তিয়ার প্রায় ৭০০ যোদ্ধা আহোমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। অভিযানের সময় ৩টি কামান, ২২৭৩টি বন্দুক, ১০৯টি হাতি এবং ১২,০০০ মুদ্রা আহোমদের হস্তগত হয়েছিল। মুদ্রাগুলো ছিল মোগল সাম্রাজ্য, আহোম, কোচবিহার এবং জৈন্তিয়া রাজ্যের। প্রচুর জীবনহানী ও ক্ষয়ক্ষতির পরে কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল ছাড়াই আহোমদের জৈন্তিয়া অভিযান সমাপ্তি লাভ করেছিল। আহোমদের জৈন্তিয়া অভিযান শেষ হলে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফা জৈন্তিয়াপতিকে জানালেন যে, যদি তাঁর রাজ্যের সরদাররা আহোমরাজের কাছে নতি স্বীকার করেন তাহলে তাকে নিজ রাজ্যে ফিরতে দেওয়া হবে। জৈন্তিয়ার সরদারদের কাছে এই বার্তা পাঠানো হলে তারা পাল্টা বার্তায় জানালেন যে, আহোমরাজের কাছে তারা নতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু জৈন্তিয়াপতির আর দেশে ফেরা হল না। তিনি হঠাৎ করে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী (ভাগিনেয়) জয়নারায়ণও আহোমদের হাতে বন্দী ছিলেন। আহোমরাজ তাকে মুক্তি দিলে তিনি জৈন্তিয়ায় ফিরে এসে সিংহাসনে বসেন। এরপর আর উভয় রাজ্যের মধ্যে কোন বৈরীতা থাকেনি।

৩৪) জয়নারায়ণ (১৭০৮ সাল – ১৭৩১ সাল): ১৭০৮ সালে জয়নারায়ণ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য প্রতিবেশী যেমন মোগলান ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল না। জয়নারায়ণের কন্যা একটি নিষিদ্ধ প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে কাছাড়ি রাজ্যের রাজধানী মাইবং-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। জয়নারায়ণ কাছাড়ি রাজার কাছে প্রেমিক-প্রেমিকাকে ফেরত চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কাছাড়ি রাজ্যে আক্রমণ করেন এবং রাজধানী মাইবং ধ্বংস করে দেন (নগরীটি অতীতে আহোদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরপর নগরীটির যতটুকু পুনর্গঠন হয়েছিল সেটুকু জৈন্তিয়াপতির হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই পরাজয়ের পর কাছাড়ি রাজা শূরদর্প নারায়ণ সমতলের ব্রক্ষপুর বা খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন)।

মোগলানের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার নায়েবে ফৌজদার দুর্লভ দাস জৈন্তিয়ার কিছু ভূমি দখল করেছিলেন। এ ঘটনার জের ধরে জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণে আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং পরগনাটিকে দখল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি

মোগলানের চারখাই পরগনাটিকেও দখল করেছিলেন। চারখাই দখলের কারণ ছিল ধর্মীয়। সেখানকার সেনগ্রামের 'হাটকেশ্বর শিব'-কে রাজা তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দৈব কারণে (জনশ্রুতি অনুযায়ী) তিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই 'হাটকেশ্বর শিব'-কে নিজের রাজ্যে রাখার জন্য তিনি চারখাই পরগনাটিকে নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। জয়নারায়নের শাসনকালের গড় হিসেবে এসব ঘটনার আনুমানিক সময়কাল হচ্ছে ১৭১৯ সাল (১৭০৮ + ১৭৩১ = ৩৪৩৯, ৩৪৩৯ ÷ ২ = ১৭১৯.৫)। ঢাকাদক্ষিণ ও চারখাই পরগনাদ্বয় আনুমানিকভাবে ১৭৪০ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল।

৩৫) বড়গোসাঁই (১৭৩১ সাল – ১৭৭০ সাল): ১৭৩১ সালে জয়নারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর ভাগিনেয় বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। এই রাজা জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'দ্বিতীয় বড়গোসাঁই' নামে পরিচিত। তাকে জৈন্তিয়ার সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় রাজা বিবেচনা করা হয়। প্রায় চার দশক ধরে ক্ষমতায় থাকলেও তিনি কোন যুদ্ধে জড়াননি। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তিনি ঢাকার মোগল শাসনকর্তা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদলের হাতে ঢাকাদক্ষিণ পরগনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। একইভাবে চারখাই পরগনাও ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে অনুমেয়। রাজা বড়গোসাঁই মোগলদের সাথে শুধু সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিই করেননি; তাদের সাথে মৈত্রীসম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। এই মৈত্রীসম্পর্কের অংশ হিসেবে নওয়াজিশ রাজার বোন ভৈরবী কুয়ঁরীকে বিবাহ করেছিলেন। ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের পর সেখানকার অনেকেই মিত্ররাজ্য জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৭৬০ এর দশকে ভৈরবী কুয়ঁরী, কুয়ঁরীপুত্র ফতেহ খাঁ, হযরত কাশিম শাহ, সোনা খাঁ ও পহহার খাঁ-র নেতৃত্বে অনেক মোগল সৈন্য, রাজ-কর্মচারী ও সাধারণ মুসলমান জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রাজা বড়গোসাঁই তাদেরকে জায়গা-জমি দিয়ে পূণর্বাসন করেছিলেন এবং অনেককে রাজ-কর্মচারীর চাকুরীও দিয়েছিলেন। রাজা ফতেহ খাঁ-কে রাজ্যের সেনাপতি, পহহার খাঁ-কে সহ-সেনাপতি, হযরত কাশিম শাহকে রাজ দরবারের বিচারক এবং সোনা খাঁ-কে হওলাদার নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্যের পুরো ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন ফতেহ খাঁ। অত্যাধিক স্নেহের বশবর্তী হয়ে রাজা তাঁর হাতে পুরো রাজ্যক্ষমতাই তোলে দিয়েছিলেন। ঢাকার মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠা ফতেহ খাঁ জৈন্তিয়ার রাজ-ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি নিজ হাতে পুরো রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এতে জৈন্তিয়ার রাজ-প্রতিনিধিরা

গোপনে মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। তাঁরা রাজাকে ভুল বুঝিয়ে ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার জেরে খাসিয়া পাহাড়ের খাইরম পুঞ্জির সিয়েম বড়মাণিক রাজাকে বন্দী করেন। ফতেহ খাঁ বিরোধী রাজ-প্রতিনিধিরা রাজাকে মুক্ত করেন।

মুক্ত হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন, ফতেহ খাঁ নির্দোষ ছিলেন। ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র বন্দরহাটিতে একটি বিশাল রাজকীয় মসজিদ নির্মাণ করেন এবং হযরত কাশিম শাহকে এই মসজিদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। কিন্তু এতেও রাজার অনুশোচনা দূর হচ্ছিল না। তিনি রাজ্য পরিচালনায় উদাসীন হয়ে পড়েন ও হযরত কাশিম শাহের কাছে কুরআন শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় লীলাপুরী স্বামী নামক এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী জৈন্তিয়ায় এসে রাজাকে সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাজা তখন লীলাপুরী স্বামীকে একটি রাজকীয় কালীমন্দির বানিয়ে দেন ও ভাগিনেয় ছত্রসিংহের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যান। বাকি জীবন তিনি লখডং পুঞ্জির বড়ঘাট গ্রামে সন্ন্যাসী হিসেবেই কাটিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি দৃষ্টিনন্দন মঠ নির্মাণ করেছিলেন যা 'মঠ সিয়েম' নামে আজও পরিচিত। সেখানে তাঁর বাসস্থানের অবশেষও রয়েছে।

৩৬) ছত্রসিংহ (১৭৭০ সাল – ১৭৭৪ সাল): ১৭৭০ সালে রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ভাগিনেয় ছত্রসিংহের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে জৈন্তিয়া রাজ্য আবারও যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। তবে এবারের শত্রু ছিল একেবারেই নতুন একটি শক্তি- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমবারের মতো সিলেটে একজন ব্রিটিশ রাজস্ব কর্মকর্তা নিযুক্ত করে। তাঁর নাম ছিল উইলিয়াম মেকপিস থেকারে। সিলেটে আসার পরপরই তিনি জৈন্তিয়া দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৭৪ সালে তাঁর অনুরোধে সাঁড়া দিয়ে কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তারা ক্যাপ্টেন এলিকারের নেতৃত্বে সিলেটে একদল সৈন্য পাঠান। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই দলটি ১৭৭৪ সালের মার্চ মাসে জৈন্তিয়া আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের এই অভিযান চূড়ান্তভাবে সফল হয়নি। অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই অভিযানটি প্রত্যাহার করেছিলেন। রাজার সাথে কোম্পানির একটি শান্তিচুক্তি হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যের সমতল অংশ ফেরত লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে ১৫,০০০ টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। তবে রাজ্য উদ্ধারের অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৩৭) যাত্রানারায়ণ (১৭৭৪ সাল – ১৭৮৫ সাল): রাজা ছত্রসিংহের আকস্মিক মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় যাত্রানারায়ণ। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে শান্তি বজায় রেখেছিলেন। এমনকি সিলেটের নতুন ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে তিনি জৈন্তিয়া সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। এই কর্মকর্তার নাম ছিল রবার্ট লিন্ডসে। তিনি রাজার আমন্ত্রণে সাঁড়া দিয়ে জৈন্তিয়ার একটি শিকার উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই জৈন্তিয়া-ব্রিটিশ স্বাভাবিক সম্পর্কের আড়ালে অন্য কিছু চলছিল। ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যত শান্তি বজায় রাখলেও যাত্রানারায়ণ গোপনে সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে সাহায্য করছিলেন। ১৭৮৩ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল (তাঁর মৃত্যুর বছর) পর্যন্ত তিনি সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছিলেন। এই ব্রিটিশবিরোধী পরিকল্পনার সাথে কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণও জড়িত ছিলেন।

৩৮) বিজয়নারায়ণ (১৭৮৫ সাল – ১৭৮৮ সাল): ১৭৮৫ সালে যাত্রানারায়ণের মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় বিজয়নারায়ণ। তিনিও ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যত স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখলেও গোপনে গোপনে সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে মদদ দিয়েছিলেন। ১৭৮৬ সালে সিলেটের বিদ্রোহীরা কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে দেয়। তারা পূর্ব সিলেটের চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা বাজারে স্থাপিত একটি নীল কুঠি জ্বালিয়ে দেয়। এরপর তারা চরগোলা থানা আক্রমণ করে কোম্পানি সরকারের থানাদারকে পরাজিত করে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রবার্ট লিন্ডসে লেফটেন্যান্ট ডেভিডসনের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একদল সৈন্য পাঠান। ২০ জন ছাড়া তাদের সকলেই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। এরপর ডেভিডসনের নেতৃত্বে আবারও সৈন্যদল পাঠানো হয়। এবার ডেভিডসনসহ সকলেই নিহত হন। তৃতীয়বার অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনী বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করে পূর্ব সিলেটে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

এরপর সিলেটের বিদ্রোহীরা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। এই গোলযোগের মধ্যে রাজা বিজয়নারায়ণ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন নারতিয়াং পুঞ্জির সরদারপুত্র লক্ষ্মী সিংহ। এই লক্ষ্মীর পিতা উপাংদলই ছিলেন একজন প্রভাবশালী পাহাড়ি সরদার বা দলই। তাঁর আহ্বানে জৈন্তিয়া পাহাড়ের সকল সরদার (দলই) ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজা বিজয়নারায়ণকে বয়কট করেছিলেন।

এক পর্যায়ে তারা সমতলের রাজ-প্রধানদের (রাজ মানে পরগনা) সাথে মিলে রাজা বিজয়নারায়ণকে হত্যা করে লক্ষ্মী সিংহকে জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় বসান। রাজা বিজয়নারায়ণকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে তাঁর সমাধিঘরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। পর্যটকদের কাছে এই জায়গাটি 'শাপলা বিল' নামে পরিচিত। রাজা বিজয়নারায়ণের হাতে নির্মিত একটি স্থাপনা আজও তাঁর উদার মনের পরিচয় বহন করে। এটি হচ্ছে হযরত শাহজি (রাহ.)-র মোকাম বা সমাধি।

৩৯) লক্ষ্মী সিংহ (১৭৮৮ সাল – ১৭৯০ সাল): রাজা বিজয়নারায়ণের আমলে লক্ষ্মী সিংহ ছিলেন রাজপরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক যুবক। তিনি রাজসভাতেও স্থান পেয়েছিলেন। রাজা তাঁর মতামতকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। লক্ষ্মীর এই ক্ষমতা অন্যদের মনে হিংসার জন্ম দিল। তারা রাজ-বাদুয়াকে (গোয়েন্দা প্রধান) হাত করে লক্ষ্মীর সাথে রাজকুয়ঁরীর গোপন সম্পর্কের কথা রাজদরবারে তোলে ধরে। বিভিন্ন সাক্ষীর দ্বারা এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রাজা তা বিশ্বাস করেন এবং লক্ষ্মীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু লক্ষ্মী চতুলের খাদনলস্করের গোপন সহায়তায় জয়ন্তীপুর থেকে পালিয়ে নারতিয়াং পুঞ্জিতে চলে যান। খাদনলস্কর ধরা পড়ে গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মীর পিতা-মাতা খুবই ক্রুদ্ধ হন। তাদের আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা সমতলের সাথে বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। অবশেষে এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য পাহাড় ও সমতলের প্রধানরা এক হয়ে রাজাকে হত্যা করে লক্ষ্মীকেই ক্ষমতায় বসান। তিনি ক্ষমতায় এসেই চতুলের খাদনলস্করের পরিবারের জন্য একটি রাজকীয় বাড়ি বানিয়ে দেন। এই বাড়িটি আজও 'রাজপুত্র সোনাধনের বাড়ি' নামে পরিচিত। সোনাধন ছিলেন খাদনলস্করের একমাত্র পুত্র। রাজা লক্ষ্মীসিংহ তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

৪০) দ্বিতীয় রামসিংহ (১৭৯০ সাল – ১৮৩২ সাল): লক্ষ্মী সিংহ বেশিদিন জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় থাকেননি। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর। ১৭৯০ সালে তিনি সিংহাসন ছেড়ে নারতিয়াং পুঞ্জিতে চলে গিয়েছিলেন। তখন নতুন রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন প্রয়াত রাজা বিজয়নারায়ণের উত্তরাধিকারী (ভাগিনেয়) রামসিংহ। এই রাজা জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'দ্বিতীয় রামসিংহ' নামে পরিচিত। দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে তিনি রাজ্যটি শাসন করেছিলেন। তাঁর আমলে রাজ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। একক রাজা হিসেবে তিনিই জৈন্তিয়ায়

সবচেয়ে বেশি স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধিস্থলে একটি সমাধিঘর নির্মাণ করেন। এরপর তিনি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে মন দেন। রাজ্যের সবচেয়ে বড় নৌ-যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল সারীঘাট। নৌ-যাত্রীদের রাত্রিযাপনের সুবিধার্থে তিনি সেখানে তিনি একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। সারিঘাটের নিকটস্থ ঢুপির পাহাড়ের মাথায় তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এর নাম ছিল 'রামেশ্বর শিবমন্দির'। তবে লোকমুখে এটি 'ঢুপির মঠ' নামেই বেশি পরিচিত ছিল। এছাড়াও তিনি আরও দুটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে-রাধা-গোবিন্দের মন্দির এবং সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির।

রাজা রামসিংহের শাসনামলে রাজ্যের ভেতরের পরিস্থিতি বেশ শান্ত ছিল। কিন্তু বাইরের পরিস্থিতি ছিল খুবই ঘোলাটে। মণিপুরের রাজা চৌরজিৎ সিং তাঁর ভাইয়ের হাতে সিংহাসন হারিয়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সাথে কিছু কুকী যোদ্ধাও জৈন্তিয়ায় এসেছিল। এর কয়েক বছর পরে বর্মীরা মণিপুরে আক্রমণ করে। মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিং (চৌরজিৎ সিং-এর ছোটভাই) নিজ রাজ্য হারিয়ে কাছাড়ি রাজ্যে চলে যান। বর্মীরা শুধু মণিপুর দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা আহোম রাজ্যও দখল করে নিয়েছিল। এরপর তারা হাত বাড়ায় কাছাড়ি রাজ্যের দিকে। এমতাবস্থায় সেখানে অবস্থানরত মণিপুরী রাজা মারজিৎ সিং ব্রিটিশ শাসিত সিলেটে আশ্রয় নেন। কাছাড়ি রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণও তখন ব্রিটিশদের আশ্রয়ে ছিলেন। ব্রিটিশরা বর্মী আধিপত্য ঠেকানোর জন্য কাছাড়ি রাজা, মণিপুরী রাজার ভাই গম্ভীর সিং এবং জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহকে নিয়ে একটি মৈত্রীজোট গঠন করে। এই জোটের মধ্যে রামসিংহ ছিলেন ব্রিটিশদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মিত্র। বর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুবিধা দিয়েছিলেন। এতে ব্রিটিশরা বেশ সহজেই বর্মীদের উপর আক্রমণ চালাতে পেরেছিল। ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই যুদ্ধটি শেষ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল। আহোম, মণিপুর ও কাছাড়ি রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডসমূহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে জৈন্তিয়া তখন একা হয়ে পড়েছিল। রাজ্যটির স্বাধীনতা কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল। এর কারণ, জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় এর কৌশলগত শক্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। রাজ্যটি কার্যত ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের

মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই এর স্বাধীনতা নির্ভর করছিল ব্রিটিশদের মর্জির ওপর। এক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে রামসিংহের মৈত্রীসম্পর্ক বা চুক্তিটি ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ। এই চুক্তির কারণে রামসিংহের জীবদ্দশায় ব্রিটিশরা রাজ্যটি দখলের চেষ্টা থেকে বিরত ছিল (যদিও কৌশলগতভাবে রাজ্যটি তাদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল)। রামসিংহের জীবদ্দশায় চুক্তি লঙ্ঘন করতে না চাইলেও পরবর্তীতে তারা ঠুনকো ও বানোয়াট অজুহাতে রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিল।

৪১) রাজেন্দ্র সিংহ বা ইন্দ্র সিংহ (১৮৩২ সাল – ১৮৩৫ সাল): জৈন্তিয়ার ইতিহাসের শেষ রাজার নাম রাজেন্দ্র সিংহ। লোকজন তাকে ইন্দ্র সিংহ নামেও ডাকতো। ব্রিটিশ দলিলপত্রেও এই নামটির উল্লেখ আছে। তাই দুটি নামই সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। ১৮৩২ সালে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজেন্দ্র সিংহ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র আড়াই বছর জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় ছিলেন। ১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ ব্রিটিশরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশ দখল করে নেয়। এরপর তাকে গৃহবন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়িতে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী থাকার পর ১৮৬১ সালে এই দুর্ভাগা রাজা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অল্পসময় ক্ষমতায় থাকায় তিনি কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে পারেননি। তাঁর সময়কার কোন মুদ্রাও পাওয়া যায়নি।



চিত্র: জৈন্তিয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ

অধ্যায় ছয়
জৈন্তিয়ার রাজদপ্তর ও রাজকোষ

জৈন্তিয়ার রাজধানীতে যেসব স্থাপনার অবশেষ আজও টিকে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'জৈন্তেশ্বরী বাড়ি' নামক একটি বিশাল রাজকীয় বাড়ি এবং এর সুউচ্চ ফটকের একাংশ। বাড়িটির প্রকৃত ইতিহাস অর্থাৎ এটি কীভাবে এবং কেন নির্মিত হয়েছিল তা কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়না। কোন তাম্রফলক বা শিলালিপিতেও এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা, স্থানীয় প্রবীণদের মত এবং জনশ্রুতি থেকে আঁচ করা যায় যে, বাড়িটি মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজেই ব্যবহার করা হতো। এর মধ্যে প্রথমেই আসে বলি বা মৃত্যুদণ্ডের কথা। জৈন্তিয়া রাজ্যের সকল বড় অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো এ বাড়িতেই। বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটি গোল বেদির উপর আসামীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। বেলেপাথরে নির্মিত এই বেদিটি এখনও 'বলির পাঠাতন' নামে পরিচিত। বেদির উপরস্থ একটি কাঠামোর ওপর আসামীর মাথা রেখে বলি বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। এই কাঠামোটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির বলির পাঠাতন

জৈন্তিয়া রাজ্যের বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল অবধারিত। অপরাধ করে কেউ ছাড় পাবে- তা ছিল সিন্টেং রীতিবিরুদ্ধ। সমতলেও মোটামোটিভাবে একই নীতি কার্যকর ছিল। সমতলের হাওরাঞ্চলে ডাকাতদের প্রাদুর্ভাব রুখতে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লে রাজদরবারের বিচারে মৃত্যুদণ্ড ছিল নিশ্চিত ব্যাপার। জৈন্তিয়ার রাজদরবারে প্রতিনিয়তই অপরাধীদের বিচার চলতো। ছোট অপরাধের জন্য জরিমানা ও বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি দেওয়া হলেও বড় অপরাধের জন্য বলি বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। প্রায় সকল বলিই কার্যকর করা হতো কথিত জৈন্তেশ্বরী বাড়িতে। কদাচিৎ দু-একজন অপরাধীকে ফালজুরের বামজঙ্ঘা পীঠ অথবা নারতিয়াং মন্দিরে বলির জন্য পাঠানো হতো। সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী দেবীর তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদেরকে সেসব স্থানে বলি দেওয়া হতো। এমন বলির ঘটনা বছরে একবারই ঘটতো। বাকি সময়ে জৈন্তেশ্বরী বাড়িতেই বলি দেওয়া হতো। যুগ যুগ ধরে জৈন্তেশ্বরী বাড়ির এই বলি নিয়ে নানান গুজব প্রচলিত আছে। এসব গুজবের বেশিরভাগই কাল্পনিক ও মিথ্যা।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটকের বাইরের চিত্র

কিছু ঐতিহাসিকও জৈন্তেশ্বরী বাড়ির এই বলি নিয়ে ভুল ধারণা পোষণ করতেন। বাড়িটিকে তারা একটি পীঠস্থান মনে করতেন এবং এখানে 'জয়ন্তেশ্বরী দেবীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই' বলি দেওয়া হতো বলে ধারণা করতেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণার কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই। সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী 'জয়ন্তেশ্বরী দেবীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে' বলি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত দুটি স্থান ছিল বামজঙ্ঘা মহাপীঠ ও নারতিয়াং মন্দির। এই দুটি স্থান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত। উভয় পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী। কথিত জৈন্তেশ্বরী বাড়িটির এমন কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। জৈন্তেশ্বরী দেবীর নামে বাড়িটির নামকরণের কারণ একটি মূর্তি। জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজা যশোমাণিক (শাসনকাল: ১৬০৫ সাল - ১৬৪১ সাল) কোচবিহার থেকে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর একটি ধাতব মূর্তি উপহার পেয়েছিলেন। তিনি এই মূর্তিটিকে এই বাড়ির ভেতরেই স্থাপন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। মূর্তির কারণেই বাড়িটির এমন নামকরণ হয়েছে বলেও ধারণা করা হয়।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটকের ভেতরের চিত্র

১৭০৮ সালের জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের সময়ে আহোম সৈন্যরা এই মূর্তিটিকে তাদের রাজধানী গড়গাঁওয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবং মূর্তিটি ফেলে চলে যায়। এরপর প্রতিরোধ যোদ্ধারা নারতিয়াং গ্রামে অবস্থান নেয় এবং সেখানকার মন্দিরেই মূর্তিটি স্থাপন করে। এটি আজও সেখানেই আছে। জৈন্তেশ্বরী বাড়ি থেকে মূর্তিটি উধাও হলেও এখানকার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজ স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকে। কিন্তু বাড়িটির নাম বদলায়নি। কোন কোন লেখক বাড়িটিকে একটি মন্দির বলে দাবি করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, পুরো বাড়িটি মন্দির নয়; অন্যান্য স্থাপনার পাশাপাশি বাড়ির ভেতরে একটি মন্দির ছিল। মূর্তি উধাও হওয়ার পরেও সম্ভবত বাড়িতে একটি নতুন মূর্তি বসিয়ে উপাসনা চলতো। বাড়ির ভেতরে ও বাইরে কর্মরত রাজ-কর্মচারীদের উপাসনার সুবিধার্তেই এই মন্দিরটি চালু রাখা হয়েছিল। এটি ছিল একটি সাধারণ মন্দির; এর সাথে নরবলির কোন সম্পর্ক ছিল না।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির ভেতরে নির্মিত একটি মঞ্চসদৃশ বেদি

বাড়িটি ছিল রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র তথা রাজদপ্তর। এর একাংশে (উত্তর পাশে) ছিল রাজ্যের প্রধান রাজস্ব দপ্তর; রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কাজ এখানেই হতো বলে ধারণা করা হয়। রাজস্ব দপ্তরের কয়েক হাত উঁচু ভিটা এখনও টিকে আছে। ভিটার দক্ষিণ পাশে একটি ঘর দেখা যায়। এই ঘরের ভিটা রাজাদের আমলের হলেও ঘরটি নতুন। ঘরের ভিটায় একটি মঞ্চসদৃশ বেদি রয়েছে। এই বেদির গায়ে ফুল ও লতার নকশা রয়েছে। অপরাধীদেরকে যখন মৃত্যদণ্ডের জন্য বলির পাঠাতনে তোলা হতো, রাজা তখন এই বেদির উপরে বসতেন। রাজা সংকেত দেওয়া মাত্রই জল্লাদ অপরাধীর ঘাড়ে কোপ বসাতো। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য লোক এই হিমশীতল দৃশ্য দেখতো। এই বাড়িতে অপরাধীদেরকে আটকে রাখা হতো বলেও অনেকের ধারণা (শেষ রাজা ইন্দ্র সিংহের আমলে এখানে একজন মন্ত্রীকে বন্দী রাখা হয়েছিল বলে শোনা যায়)। বাড়িটির সুউচ্চ দেয়ালও এমন ইঙ্গিত দেয়। রাজারা অকারণে বাড়িটির চারপাশে এতো উঁচু দেয়াল নির্মাণ করেননি। বাড়ির ভেতরের দপ্তরসমূহের নিরাপত্তা এবং অস্থায়ী কারাগার হিসেবে এর ব্যবহারের জন্যই দেয়ালগুলো নির্মিত হয়েছিল।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির সুউচ্চ দেয়ালের একাংশ (ফটক সংলগ্ন)

বাড়িটির ফটকের উচ্চতাও বিস্ময়কর। এতো উঁচু ফটক জৈন্তিয়ার আর কোথাও নেই। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ফটকটি বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এর একপাশের স্তম্ভ প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। অপর পাশের স্তম্ভের প্রায় অর্ধেক টিকে আছে। ফটকের এই দুই অংশ থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যের নির্মাণশিল্পের চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। ফটকটিকে এতো উঁচু করে নির্মাণের মূল কারণ ছিল হাতি। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে রাজধানীর যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম ছিল হাতি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাতির পিঠে চড়ে রাজ-প্রতিনিধি বা রাজ-কর্মচারীগণ রাজধানীতে আসতেন। তারা হাতির পিঠে বসেই রাজদপ্তরে (জৈন্তেশ্বরী বাড়িতে) প্রবেশ করতেন। হাতির উচ্চতা এবং আরোহীর উচ্চতার যোগফলের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ফটকটি নির্মাণ করা হয়েছিল।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটক

এই ফটক এবং দেয়ালগুলো কোন রাজা নির্মাণ করেছিলেন তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। হতে পারে, রাজা যশোমাণিক এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, যশোমাণিক এখানে একটি মন্দির বানিয়ে তাতে জয়ন্তেশ্বরী মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এর বহু পরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরসহ পুরো এলাকাটিকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে এর ভেতরে রাজ্যের দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। বাড়ির সামনের দেয়ালের গায়ের কিছু চিত্রকর্ম জৈন্তিয়ার রাজাদের শৈল্পিক মনের পরিচয় তোলে ধরে। চিত্রকর্মে হাতি ও ঘোড়ার উপস্থিতি বেশ লক্ষ্যণীয়। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, দুজন বর্শাধারী ও আরেক

ব্যক্তি মিলে একটি হাতিকে পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। আরেকটি দৃশ্যে একটি বাঘকে হাতির সাথে লড়াই করতে দেখা যায়। আরেকটি দৃশ্যে দেখা যায়, হাতি পোষ মেনেছে এবং দুজন মাহুতকে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পোষা ঘোড়া এবং মুক্ত ঘোড়ারও চিত্র রয়েছে।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালের গায়ের চিত্রকর্ম

জৈন্তেশ্বরী বাড়ি বা রাজদপ্তরের মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ইতিহাসও আজানা। এটি 'বড়দেউল' নামে পরিচিত। বড়দেউল মানে হল 'বড়মন্দির'। কিন্তু বড়দেউলের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকালে মনে হয় এটি একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এতো পুরু দেয়াল জৈন্তিয়ার আর কোন স্থাপনায় দেখা যায় না। উচ্চতার বিচারেও এটি অনন্য। এর ধ্বংসস্তুপের উচ্চতা জৈন্তিয়ার অক্ষত স্থাপনাগুলোর চেয়েও বেশি। ধ্বংসস্তুপ দেখে মনে হয়, যখন এটি অক্ষত ছিল তখন রাজধানীর বাইরে থেকেও এটি দেখা যেতো। ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ায় যতো স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ছিল এটিই । জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি সাত তলার সমান উঁচু ছিল। কিন্তু সাত তলার সমান

উঁচু ভবন নির্মাণের প্রযুক্তি তখন জৈন্তিয়া বা সিলেটের কোথাও ছিল না। বড়দেউলের মূল ভবন হয়ত চারতলার সমান উঁচু ছিল এবং এর উপরে মিনারের মতো আরও তিন তলার সমান একটি বর্ধিত অংশ ছিল। স্থানীয়দের মতে, বড়দেউলে প্রবেশের জন্য কিছু সুড়ঙ্গ পথও ছিল। তাদের দাবি, এখনও খনন করলে এসব সুড়ঙ্গ পথের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।



চিত্রঃ বড়দেউলের ধ্বংসাবশেষের একাংশ

তৎকালীন যুগে ধর্মীয় উপাসনার প্রয়োজনে এমন দুর্গের মতো মন্দির নির্মাণের কোন রীতি ছিল না (জৈন্তিয়ার অন্যান্য মন্দিরগুলো দেখলে তা বোঝা যায়)। মন্দিরে প্রবেশের জন্য কোন সুড়ঙ্গ পথেরও প্রয়োজন হতো না। বড়দেউলের এসব বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা যায় যে, এটি কোন সাধারণ মন্দির ছিল না। এটি ছিল মূলত রাজ্যের মুদ্রাভাণ্ডার বা রাজকোষ। আগের যুগের রীতি অনুযায়ী রত্নভাণ্ডারে মূর্তি রাখার প্রচলন ছিল। তাই বড়দেউলের ভেতরেও হয়তো রাজারা মূর্তি রাখতেন। কিন্তু এই মূর্তির জন্যই যে বড়দেউল নির্মিত হয়েছিল তা নয়; মুদ্রা ও মূল্যবান দ্রব্য সংরক্ষণের জন্যই এটি নির্মিত হয়েছিল। যদি

কখনও রাজধানী শত্রুদের হাতে চলে যায় তাহলে বড়দেউলের সকল মুদ্রা ও ধনরত্ন নিয়ে যাতে গোপনে রাজধানী থেকে বের হওয়া যায় সেজন্য রাজারা সুড়ঙ্গ পথের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। স্থানীয়দের মতে, বড়দেউলের সুড়ঙ্গ পথ সংযুক্ত রয়েছে বড়গাং-এর সাথে। একসময় বড়গাং-এ এই সুড়ঙ্গ পথের মুখ দেখা যেত বলে তারা দাবি করে থাকেন।



চিত্র: বড়দেউলের ধ্বংসাবশেষ

১৭৭৪ সালে ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার রাজধানীর সাময়িক পতন হয়েছিল। রাজা ছত্রসিংহ এর আগেই বড়দেউলের সকল মুদ্রা ও ধনরত্ন জৈন্তিয়া পাহাড়ে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তাই ব্রিটিশরা জৈন্তিয়ার রাজধানীতে ঢুকে কোন মুদ্রা বা ধনরত্নের সন্ধান পায়নি। উল্টো রাজধানী নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থের অপচয় হচ্ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত রাজার সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ১৫,০০০ মুদ্রার বিনিময়ে তারা জৈন্তিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরেরবার তা হয়নি। ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়া দখলের পর বড়দেউল ও রাজবাড়ির সকল ধন-সম্পদ ব্রিটিশদের হস্তগত হয়। বড়দেউলে শুধু একটি ধাতব ঘন্টা অবশিষ্ট ছিল। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত এই ঘন্টাটি বাজানোর প্রচলন ছিল। ওই বছরের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের পর বড়দেউলের ঘন্টা এবং কিছু ছোট মূর্তি বিশাল ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে যায়। তখন থেকে এই বিশাল স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ একই অবস্থায় পড়ে আছে।

অধ্যায় সাত
জাফলং রাজবাড়ি

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের কিছু বিষয় আজও রহস্যাবৃত। এর মধ্যে অন্যতম হল জৈন্তিয়ার মূল রাজধানী জয়ন্তীপুরের (বর্তমান নিজপাট) বাইরে আরও তিনটি রাজধানী বা রাজবাড়ির অস্তিত্ব। এসব রাজধানী বা রাজবাড়ি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন দালিলিক ইতিহাস নেই। জনশ্রুতি ও অনুমানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা এসব রাজবাড়ির ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। রাজবাড়িগুলোর অবস্থান ছিল জয়ন্তাপুরী রাজের প্রতিবেশী জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর পরগনায় (ব্রিটিশ আমলে রাজকে পরগনা বলা হতো)। বর্তমানে শুধু জাফলং রাজবাড়ির কিছু অংশ টিকে আছে; বাকি দুটোর কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে দূরবর্তী এই রাজবাড়িগুলোর অস্তিত্ব ব্রিটিশ আমলে পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান ছিল। তখন মানুষের মধ্যে এসব রাজবাড়ি নিয়ে বেশ কৌতুহল ছিল। এসব রাজবাড়ির আদি বাসিন্দা অর্থাৎ রাজাদেরকে নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। এসব কিংবদন্তী থেকে ঐতিহাসিকরা কিছু রাজাদের নাম ও তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উদ্ধার করেছেন।

জাফলং নদীর তীরবর্তী বল্লাপুঞ্জি-জুমপার এলাকায় অবস্থিত জাফলং রাজবাড়িটি একসময় স্থানীয়দের কাছে 'মাইলং রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। 'জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস' বইটির লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের মতে, মাইলং রাজা ছিলেন জৈন্তিয়ার পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা জয়ন্ত রায়ের পুত্র। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের (১৪৫০-১৫০০ সাল) কোন এক সময়ে রাজা জয়ন্ত রায় জাফলং খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি করে তা মাইলং রাজাকে দিয়েছিলেন (জয়ন্ত রায় জৈন্তিয়াকে কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে ভাগ করে তাঁর সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন)। এই খণ্ডরাজ্যের রাজধানী ছিল জাফলং নদীর তীরে। রাজবাড়িটি এই রাজধানীরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। বর্তমানে এই রাজবাড়িতে যা যা টিকে আছে তা আসল রাজবাড়ির সামান্য অংশমাত্র। রাজধানী ও রাজবাড়ির মূল স্থাপনাসমূহ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দুটি ফটক ও দুটি দেয়ালের কিছু অংশ এখনও অক্ষত। দেয়ালের পুরুত্ব

ও ফটকগুলোর গঠনশৈলী দেখে মনে হয় জৈন্তিয়ার অন্যান্য স্থাপনার তুলনায় এগুলো বয়স বেশি।



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির প্রধান ফটক

অন্যান্য ঐতিহাসিকরা এই রাজবাড়ি সম্পর্কে ভিন্ন ধরণের তথ্য দিয়েছেন। তাদের মতে, এই বাড়িটি ছিল প্রাচীন মালনিয়াং রাজ্যের রাজবাড়ি। মালনিয়াং রাজ্যের রাজধানী ছিল জাফলংয়ের বল্লাপুঞ্জি এলাকায়; এই রাজধানীর বেশিরভাগ স্থাপনা বিলীন হয়ে গেলেও রাজবাড়ির একটি অংশ টিকে আছে। এই মালনিয়াং রাজ্যটি একটি রহস্যময় রাজ্য। এর কোন স্পষ্ট ইতিহাস নেই। জৈন্তিয়ার ভেতরে এই রাজ্যটি কী করে সৃষ্টি হল তা কেউ ব্যাখ্যা করেননি। ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'খাসিয়া জনগোষ্ঠী: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক রুশ পতাম দাবি করেছেন, মালনিয়াং রাজ্যের রাজধানী প্রথমে অন্যত্র ছিল। তখন রাজ্যটি অনেক বড় ছিল। একসময় এর দু'পাশের গৌড় ও জৈন্তিয়ার রাজারা প্রভাবশালী হয়ে উঠলে রাজ্যটির আয়তন কমে যায়। তখন 'বালা' নামক স্থানে রাজ্যটির রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই 'বালা' স্থানটিই বর্তমানের বল্লাপুঞ্জি বা বল্লাঘাট এলাকা। 'বালা'-র নিকটে রাজারা কিছু প্রস্তর

ফলক স্থাপন করেছিলেন। রাজাদের মতৃভাষায় এসব প্রস্তর ফলককে বলা হতো ‘ফ্লুং’। এই ‘ফ্লুং’ শব্দটি থেকেই প্রথমে ‘ইয়াওফ্লাং’ ও পরে ‘জাফলং’ শব্দটির উৎপত্তি হয়। রুশ পতাম আরও দাবি করেছেন যে, মালনিয়াং রাজ্যটি ত্রয়োদশ শতকের (১২০১-১৩০০ সাল) আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির প্রধান ফটক

রাজ্যটি সম্পর্কে আরও কিছু গ্রন্থ থেকে ভাসা ভাসা তথ্য পাওয়া যায়। এইচ. এম. বারেহ রচিত ‘ENCYCLOPEDIA OF NORTH EAST INDIA’, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী রচিত ‘THE KHASI CANVAS: A CULTURAL AND POLITICAL HISTORY’ ও ‘KI KHUM KHASI-KHARA (THE KHASI PEOPLE)’ গ্রন্থদ্বয় এবং ডক্টর হোমিওয়েল লিংদহ রচিত ‘KI SYIEM KHASI BAD SYNTENG’ গ্রন্থে মালনিয়াং রাজ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে। ডক্টর হোমিওয়েল লিংদহ রাজ্যটি সম্পর্কে বলেছেন, “The Malyangiang Syiems or Madur Maskut Syiems were great and powerful Syiems of these hills. The people used to call them ‘God Kings’; and their kingdom tradition holds, touched Damer (Dimarua) in Nowgong is Assam to the north, running along

the Khasi and Jaintia Hills up to Kuwain (Sylhet) in the south. Tradition affirms that at one time the kingdom included the whole of Jaintia Hills. After Kyllong Raja was killed, the Synteng (Jaintia) succeeded in conquering and annexing the Kingdom of Madur Maskut. From that time, the Malyangiang people were scattered throughout Khasi and Jaintia Hills. According to tradition, from the time that disappearance of the Malyangiang kingdom till the advent of the British, seven generations have passed by. If you allow 25 years for a generation and if you take 1826 as the year when the East India Company first came to these Hills, the Kingdom of Maskut came to an end in 1651 i.e. at the time of Jasamanta Roy, the Syiem of the Synteng people and Jaintapur." (খাসিয়া ভাষায় রচিত মূল বই থেকে এই অংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন 'THE KHASI PEOPLE' গ্রন্থের লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী)



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির দ্বিতীয় ফটক

ডক্টর লিংদহ এর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, মালনিয়াং রাজ্যটি 'মাদুর মাস্কুট' নামেও পরিচিত ছিল এবং এর রাজাদের উপাধি ছিল 'সিয়েম'। তাদের শাসনাধীন এলাকা সিলেটের গোয়াইনঘাট অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আসামের নগাঁও জেলার ডিমারুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বর্ণনা অনুযায়ী, মালনিয়াং রাজ্যটি ছিল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বাকৃতির একটি রাজ্য। এর দক্ষিণপ্রান্ত ছিল সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকায়, উত্তরপ্রান্ত ছিল আসামের নগাঁও জেলার সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত আর মধ্যবর্তী অংশ ছিল খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত (খাসিয়া পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তবর্তী কিছু অংশ এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তবর্তী কিছু অংশ মালনিয়াং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। জনশ্রুতি অনুযায়ী, একসময় জৈন্তিয়া পাহাড়ের পুরোটাই মালনিয়াং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিল্লং রাজা নিহত হওয়ার পরে সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর হাতে মালনিয়াং বা মাদুর মাস্কুট রাজ্যটির পতন হয়। তখন থেকে মালনিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকজন খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে (এই জনগোষ্ঠীর লোকজন খাসিয়াদের একটি শাখা অর্থাৎ 'কুর' হিসেবে স্বীকৃত ছিল)। সিন্টেংদের হাতে মাদুর মাস্কুটের পতনের সাত প্রজন্ম পরে এই অঞ্চলে ব্রিটশদের আগমন হয়েছিল।

ডক্টর লিংদহ বলেছেন, যদি একটি প্রজন্মের সময়কালকে ২৫ বছর বিবেচনা করা হয় তাহলে ১৬৫১ সালকে মালনিয়াং বা মাদুর মাস্কুট রাজ্যের পতনের সময়কাল ধরতে হবে। এই সময়ে সিন্টেংদের সিয়েম বা জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন যশোমন্ত রায়। হয়তো তিনিই কিল্লং রাজাকে হত্যা করে মালনিয়াং রাজ্যটিকে জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, এর বহু আগেই জাফলং খণ্ডরাজ্যটি (মালনিয়াং রাজ্য) জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৫৬৪ সালের আগের কোন এক সময়ে এই রাজ্যটি দখল করেছিলেন জৈন্তিয়ার রাজা বিজয় মাণিক। রাজ্যটির শেষ রাজার নাম নিয়েও সংশয় আছে। ডক্টর লিংদহ কিল্লং রাজাকে শেষ রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যদের মতে, মাইলং রাজাই ছিলেন শেষ রাজা। গবেষক রুশ পতাম এই রাজ্যের আরও দুজন রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন- নিয়াং রাজা ও কন্দুর রাজা। এদেরকে নিয়ে মালনিয়াং রাজ্যের মোট চারজন রাজার নাম জানা সম্ভব হয়েছে। এই রাজ্যটির অস্তিত্ব নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ

নেই। সিন্টেং রাজাদের আমলে এটি জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের আগে এটি একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল।



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির দ্বিতীয় ফটক

মালনিয়াং ও জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, রুশ পতামের অনুমান অনুযায়ী ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে মালনিয়াং রাজ্যটি বিলুপ্ত হয়নি। বরং ওই সময়েই খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের কেন্দ্রিয় অঞ্চলে রাজ্যটির উদ্ভব হয়েছিল এবং একসময় জৈন্তিয়া সমতলের কিছু অংশ (জাফলং অঞ্চল) এর অধীনে চলে গিয়েছিল। জৈন্তিয়ার কৃষক রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কামদেব। আনুমানিকভাবে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে জৈন্তিয়া রাজ্যের অধঃপতন শুরু হয় এবং ক্রমশ এর আয়তন সংকুচিত হয়ে আসে। সীমানা সংকুচনের এই পর্বে জৈন্তিয়ার কিছু ভূখণ্ড পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর কিছু রাজা বা সরদারের অধীনে চলে যায়। ওই সময়ে পাহাড়ি রাজা বা সরদাররা যেসব স্বাধীন রাজ্য বা খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মধ্যে মালনিয়াং ছিল সবচেয়ে বড়। মালনিয়াং রাজ্যের মতো জৈন্তিয়ার ভূখণ্ডে জন্ম নেওয়া আরও দুটি খণ্ডরাজ্য ছিল ফালজুর ও চারিকাটা।

এসব খণ্ডরাজ্যের উত্থানের ফলে মূল জৈন্তিয়া রাজ্যটি তখন কেবলমাত্র জয়ন্তাপুরী রাজ ও এর আশেপাশের কিছু অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ষোড়শ শতকের সূচনার দিকে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। কিন্তু এতে জৈন্তিয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেনি; বরং এর উল্টোটাই ঘটেছিল। পাহাড়ি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর সিয়েমের হাতে জৈন্তিয়ার পুরোহিত রাজবংশের অবসান হলে রাজ্যটি নতুন শক্তিতে ঘুরে দাঁড়ায়। সিন্টেং রাজবংশের হাতে রাজ্যটির সম্প্রসারণ ঘটে। মালনিয়াং রাজ্য বা জাফলং খণ্ডরাজ্য, চারিকাটা খণ্ডরাজ্য এবং ফালজুর খণ্ডরাজ্য ছাড়াও অনেক নতুন অঞ্চলকে সিন্টেং রাজারা তাদের অধীনস্ত করেছিলেন। এসব অঞ্চল জৈন্তিয়ার প্রশাসনিক অঞ্চল বা ‘রাজ’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাদের শাসনামলে জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর ছিল জৈন্তিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি রাজ (খেলুরাজ)।



চিত্রঃ মানবসৃষ্ট কারণে ধ্বংসের মুখে জাফলং রাজবাড়ি

অধ্যায় আট
চারিকাটা রাজবাড়ি

জৈন্তিয়া রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজ বা পরগনাসমূহের মধ্যে চারিকাটা ছিল অন্যতম। বর্তমানে এই অঞ্চলটি জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়ন নামে পরিচিত। এই ইউনিয়নের ভিত্রিখেল গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন রাজবাড়ির রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। স্থানীয়ভাবে 'দুধরাজার বাড়ি' নামে পরিচিত এই বাড়িটির স্থাপনাসমূহ প্রায় বিলীন হয়ে গেলেও বাড়ির মাটির নিচে অনেক কিছুর সন্ধান মিলতে পারে বলে অনেকের ধারণা। বর্তমানে এই বাড়িতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপনা চোখে না পড়লেও স্থানীয় প্রবীণদের মুখে এই বাড়ির রাজকীয় স্থাপনাসমূহের গল্প শোনা যায়। তাদের দাবি, কয়েক দশক পূর্বেও বাড়িটিতে বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনার অস্তিত্ব দৃশ্যমান ছিল। দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির ইট ও পাথর চুরি হওয়ার কারণে স্থাপনাগুলোকে এখন আর দেখা যায় না। গুপ্তধনের লোভেও অনেকে স্থাপনাসমূহের ক্ষতি করেছে। একাংশে বসতবাড়ি স্থাপিত হওয়ার কারণেও রাজবাড়ির বিলুপ্তির প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়েছে।

তবে এখনও এর অরণ্য ও আবর্জনার নিচে কিছু স্থাপনা চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের ধারণা। বাড়িটির দিকে তাকালেও এমনই মনে হয়। বাড়িটিকে দেখলেই মনে হয় যে, এর মাটির নিচে ইতিহাসের অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। বাড়িটির অবস্থান একটি টিলার ওপরে। স্থানীয়দের কাছে এটি 'রাজবাড়ির টিলা' নামে পরিচিত। টিলাটি এখন ঘোর অরণ্যে আচ্ছাদিত। অরণ্যের মধ্যে কিছু উঁচু উঁচু স্তুপ রয়েছে। এসব স্তুপের মধ্যে প্রাচীন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বলেই মনে হয়। বর্তমানে বাড়িটির একাংশে বসবাসরত বাসিন্দারাও এমন মত ব্যক্ত করেন। তারা জানান, কয়েক বছর আগেও রাজবাড়ির চারপাশে প্রাচীন ইট ও চুন-সুরকির ছড়াছড়ি দেখা যেতো। গুপ্তধন শিকারীরাই অরণ্যের ভেতর থেকে এসব ইট ও চুন-সুরকি বের করে এনেছিল বলে তাদের ধারণা। অযত্নে-অবহেলায় এই বাড়ির বিভিন্ন মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন হারিয়ে গেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননের মাধ্যমে এখনও এখান থেকে অনেক তথ্য উদ্ধারের সুযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখাতেও এই বাড়ির কথা পাওয়া যায়। এসব লেখকের বর্ণনার সাথে স্থানীয় প্রবীণদের বর্ণনার মিল রয়েছে। উভয় সূত্র থেকেই নিশ্চিত

হওয়া যায় যে, একসময় এই বাড়িতে বিভিন্ন রাজকীয় স্থাপনার অস্তিত্ব ছিল। তবে এসব স্থাপনা পুরোপুরিভাবে অক্ষত ছিল না। ১৮৯৭ সালের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে জৈন্তিয়া রাজ্যের সকল বড় বড় স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। চারিকাটা রাজবাড়িতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। ভূমিকম্পে বাড়িটির বড় বড় স্থাপনাসমূহ ভেঙ্গে পড়েছিল। তবে জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতোই এখানেও কিছু ছোট স্থাপনা (ছোট দালান, ফটক, ইন্দারা প্রভৃতি) বেঁচে গিয়েছিল বলে অনুমেয়। স্থানীয় প্রবীণদের বক্তব্য থেকেও এটি প্রতীয়মান হয়। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও দুধরাজার বাড়িতে কিছু অক্ষত স্থাপনার অস্তিত্ব ছিল। তাদের দাবি, ১৯৮০-র দশকেও বাড়িটির দু-একটি দালান, ফটক, ইন্দারা প্রভৃতি স্থাপনা অক্ষত অবস্থায় ছিল।

অতীতে সরকারি খতিয়ানে এই বাড়িটি একটি রাজবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাড়ির জায়গা এখানকার বাসিন্দাদের নামেই রেকর্ডভুক্ত আছে। চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্রিখেল পশ্চিম মৌজার অন্তর্গত এই বাড়িটি সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তামাবিল মহাসড়কের দরবস্ত বাজার থেকে দরবস্ত-চারিকাটা রাস্তা ধরে তিন-চার কিলোমিটার অগ্রসর হলে রাস্তার পাশেই বাড়িটির দেখা পাওয়া যায়। বর্তমানে বাড়িটিতে কোন দৃশ্যমান নিদর্শন না থাকলেও স্থানীয়দের কাছে এটি 'রাজবাড়ি' হিসেবেই পরিচিত। বাড়ির পাশের পুকুরটিও 'রাজার পুকুর' হিসেবেই পরিচিত। রাজবাড়ির একাংশে বসবাসরত বাসিন্দাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, পুকুরটি রাজবাড়িরই অংশ। যখন এই বাড়িতে রাজা বসবাস করতেন তখন তিনি এই পুকুরেই স্নান করতেন। এটি কয়েকশ বছরের পুরানো একটি পুকুর।

চারিকাটার এই রাজবাড়ি কে কবে নির্মাণ করেছিলেন তা জানার কোন সূত্র নেই। কেবল অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৫০০ সালের আগের কোন এক সময়ে জৈন্তিয়ার রাজার দুর্বলতার সুযোগে জনৈক পাহাড়ি সরদার চারিকাটায় একটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর রাজধানী হিসেবে রাজবাড়িটিও নির্মাণ করেছিলেন। বাড়ির পাশের প্রাচীন পুকুরটিও তিনিই খনন করেছিলেন। অনির্দিষ্টকাল ধরে সেই সরদার এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা স্বাধীনভাবে চারিকাটা শাসন করেছিলেন (সেখানে জৈন্তিয়ার রাজার কোন কর্তৃত্ব ছিল না)। ১৫০০ সালের পরবর্তী সময়ে জৈন্তিয়ায় সিন্টেং রাজাদের

শাসন শুরু হলে জৈন্তিয়া আবারও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন চারিকাটাসহ বিভিন্ন স্বাধীন খণ্ডরাজ্য আবারও জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এসব অঞ্চল জৈন্তিয়ার 'রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। চারিকাটার শেষ রাজা অর্থাৎ দুধরাজার প্রকৃত নাম কী ছিল তা-ও জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার রাজা বিজয় মাণিকের হাতে চারিকাটার পতন ঘটে। এই ঘটনা ১৫৫০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে ঘটেছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

অধ্যায় নয়
ফালজুর রাজবাড়ি

জৈন্তাপুর উপজেলার লালাখালের নিকটবর্তী বালিদাড়া গ্রামের একটি সুউচ্চ টিলার নাম 'ইয়াং রাজার টিলা'। টিলাটির এমন নামকরণের কারণ হল, যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে এই টিলার উপরের একটি প্রাচীন রাজবাড়ির কথা প্রচলিত রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এই বাড়িটির কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট ছিল বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে বাড়িটির কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। কয়েক দশক আগেও এখানে সামান্য কিছু ইট ও চুন-সুরকির নিদর্শন দেখা যেতো; এখন প্রায় কিছুই দেখা যায় না। টিলার মাথায় যখন রাজবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এর সাথে একটি পুকুরও খনন করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং স্থানীয় প্রবীণদের মুখ থেকে পাহাড়ের উপরস্থ এই পুকুরটির কথা জানা গেলেও বর্তমানে এর চিহ্ন প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভূমি থেকে কয়েকশ' মিটার উঁচুতে নির্মিত এই বাড়িতে উঠার জন্য একটি পাথরের সিঁড়িও ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে এই সিঁড়ির কোন চিহ্ন আর নেই। ভূমি থেকে এতো উঁচুতে, টিলার একদম মাথায় এই রাজবাড়ি নির্মাণের কারণ কিছুটা অনুমেয়।

যে রাজা এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন তিনি একজন স্থানীয় পাহাড়ি সরদার ছিলেন। ১৫০০ সালের আগের কোন এক সময়ে তিনি পাহাড় ও সমতলের কিছু অংশ নিয়ে একটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অধীনস্ত সমতল অঞ্চল ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের অংশ। কিন্তু জৈন্তিয়ায় তখন একটি দুর্বল রাজবংশের শাসন চলছিল। তাই জৈন্তিয়ার রাজা এই স্বাধীন সরদারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তবে এই সরদার জৈন্তিয়ার রাজার পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় একেবারে উড়িয়ে দেননি। তাই তিনি অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি জায়গায় রাজধানী বা রাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়িটি ছিল মূলত একটি দুর্গ। দূর থেকে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে যাতে আগাম প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সেজন্যই এতো উঁচুতে এই দুর্গ বা রাজবাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। একই সাথে এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, পাহাড় ও সমতলে সমান প্রভাব বজায় রাখার জন্যই ওই সরদার পাহাড় ও সমতলের ঠিক মিলনস্থলে এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। যখন বাড়িটি নির্মাণ করা

হয়েছিল তখন টিলার মাথা কেটে সমান করা হয়েছিল। আজও তা অনেকটাই সমতল রয়েছে।

জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এই বাড়ির দুজন রাজার নাম জানা যায়। এরা হলেন ইয়াং রাজা ও লং রাজা। জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন ইয়াং রাজা। আর ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই বাড়ির শেষ রাজা ছিলেন লং রাজা। ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, লং রাজা ছিলেন সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মানুষ। তাঁর অধীনস্ত সমতল অঞ্চলের নাম ছিল 'ফালজুর'। এই অঞ্চলটি বর্তমানে জৈন্তাপুর ও কানাইঘাট উপজেলার অন্তর্গত। জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশের লালাখাল থেকে মুলাগুল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের শেষ স্বাধীন সরদার বা রাজা ছিলেন লং রাজা। ১৫৫০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা বিজয় মাণিকের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তখন থেকে ফালজুর জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'রাজ' বা প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ব্রিটিশ লেখক কর্নেল গর্ডনও ফালজুরকে সিন্টেংদের একটি প্রভাবশালী রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ফালজুরের লং রাজাকে 'জৈন্তিয়ার রাজা' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন (এই দাবিটি অতিরঞ্জিত)।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে ফালজুর খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং রাজার কথাও জানা যায়। তাকে নিয়ে কিছু অদ্ভূত কাহিনী বা কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এসব কাহিনী পুরোপুরি অবাস্তব ও অলৌকিক গল্পের পর্যায়েই পড়ে। একসময় এসব গল্প ফালজুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এসব গল্পের নায়ক ইয়াং রাজা বাস্তবের কোন রাজা নন; তিনি একজন রূপকথার রাজা। বালিদাড়া গ্রামের মানুষের মধ্যে এখনও এসব গল্প প্রচলিত আছে। এসব গল্প থেকে জানা যায়, ফালজুরের ইয়াং রাজা ছিলেন অত্যন্ত রহস্যময় এক ব্যক্তি। তিনি সুউচ্চ পাহাড়ের মাথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় নির্মিত রাজপ্রাসাদে তাঁর মন বসতো না। তিনি প্রায়ই রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের নিচে চলে যেতেন এবং কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ থাকতেন। প্রতি সপ্তাহেই এই ঘটনা ঘটতো; সপ্তাহের দু-তিন দিন তিনি প্রাসাদের বাইরের কোনো এক অজানা জায়গায় কাটাতেন। এ নিয়ে একদিন রানীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। কৌতূহলী রানী রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর এই ঘন ঘন অন্তর্ধানের রহস্যটা কী? কিন্তু রাজা এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। তিনি রানীকে এ ব্যাপারে কৌতূহল নিবারণের পরামর্শ

দিলেন। তিনি আরও বললেন যে, রানীর এই অযাচিত কৌতূহল তাদের উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু রানী রাজার এই উপদেশ মানলেন না। তিনি আরও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। একদিন গভীর রাতে রাজা প্রাসাদ ছেড়ে বের হওয়ার পর রানীও লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর পিঁছু নিলেন। রাজা চললেন পাহাড়ের নিচের একটি ঝর্ণার দিকে। রানী অবাক হয়ে দেখলেন, রাজা ঝর্ণার কাছে পৌঁছে নিজের পেটের ভেতরের নাড়িভুঁড়ি বের করে আনলেন। এরপর তা ঝর্ণার পানিতে ধুয়ে নিতে শুরু করলেন। এমন ভয়ংকর দৃশ্য দেখে রানী আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। এই চিৎকারের শব্দে রাজা পেছনে ফিরে তাকালেন। নিজের নাড়িভুঁড়ি তখনও তাঁর হাতেই! এমতাবস্থায় রানীকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি রানীকে একটি কঠিন অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপে রানী একটি পেঁচায় পরিণত হয়ে গেলেন। আর রাজাও তখন ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। বালিদাড়া গ্রামের অনেকে আজও বিশ্বাস করেন যে, পেঁচারূপী সেই রানী ইয়াং রাজার টিলার আশেপাশেই বসবাস করেন এবং মাঝে মাঝে তিনি ওই ঝরনাস্থলে এসে মানুষের রূপ ধরে বসে থাকেন। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, অভিশপ্ত এই পেঁচা কারও বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করলে সেই বাড়ির লোকজনের অমঙ্গল হয়।

সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত এসব গল্পের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। তবে তা সুদূর অতীতের ইয়াং রাজা ও তাঁর রাজ্যের অস্তিত্বের পক্ষে এক জোরালো প্রমাণ বটে। তাঁর উপাখ্যান থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি জৈন্তিয়ার কোন রাজার হাতে নিহত হননি। তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত, রাতের বেলায় ঝর্ণার পানিতে স্নানের সময় তিনি কোন এক ভয়ংকর প্রাণীর খপ্পরে পড়েছিলেন। মানুষখেকো এই প্রাণীটি তাকে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছিল। পরদিন মানুষ সেখানে তাঁর নাড়িভুঁড়ির কিছু অংশ খুঁজে পেয়েছিল। এই ঘটনাটিই অতিরঞ্জিত হয়ে একসময় রূপকথার গল্পে রূপ নিয়েছিল। তাঁর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা ফালজুর শাসন করেছিলেন। লং রাজা ছিলেন তাঁর শেষ উত্তরাধিকারী। (ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের মতে, ইয়াং রাজাকে হত্যা করে জয়ন্তী দেবী ফালজুর দখল করেছিলেন। কিন্তু ইয়াং রাজার উপাখ্যানে এমন কোন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কর্নেল গর্ডন ও সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মত অনুযায়ী লং রাজাকেই

ফালজুরের শেষ রাজা মনে করাই শ্রেয়। একই সাথে ইয়াং রাজাকে ফালজুরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা মনে করাই শ্রেয়।)

জৈন্তিয়ার পূর্বাঞ্চল যখন ফালজুরের রাজাদের অধীনস্ত ছিল তখন জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে সুরমা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে এই এলাকার বেশিরভাগই ছিল জলাভূমি; স্থলভাগ ছিল খুবই কম। জৈন্তাপুর উপজেলার লালাখাল থেকে কানাইঘাট উপজেলার মুলাগুল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সরু আকৃতির ভূখণ্ডই ছিল তখনকার পূর্ব-জৈন্তিয়ার মূল জনপদ। এই জনপদের সীমান্তবর্তী সাতবাক অঞ্চলটি তখন পলিমাটি দ্বারা ভরাট হয়ে আবাদ ও বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠছিল। খুব সম্ভবত, এই নতুন চরাঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েই পঞ্চদশ শতকের মাঝামঝি সময়ে ফালজুরের রাজার সাথে শ্রীহট্টের (তখন সিলেটের নাম ছিল 'সরকার-ই-শ্রীহট্ট') শাসকদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। আনুমানিকভাবে ১৪৪৫ সালে এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা তখন ফালজুরের রাজার পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

এই যুদ্ধে শ্রীহট্টের সৈন্যদের ব্যাপক প্রাণহানী হয়েছিল। তাদের সেনাপতি রূপচন্দ্র নারায়ণ দত্তও পাহাড়িদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। রূপচন্দ্র নারায়ণ দত্ত ছিলেন বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর উপাধি ছিল 'সর-ই-লস্কর'। তিনি বাংলা সালতানাতের আওতাধীন শ্রীহট্ট অঞ্চল রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের আক্রমণ থেকে 'সরকার-ই-শ্রীহট্ট' এর অধীনস্ত অঞ্চলসমূহ রক্ষার জন্য বাংলার সুলতান তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধরদের কাছে রক্ষিত পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৪৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জৈন্তিয়ার সাথে শ্রীহট্টের সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজার (প্রকৃতপক্ষে ফালজুরের রাজা) হাত থেকে পূর্ব-শ্রীহট্টের একটি অঞ্চলকে রক্ষার জন্য রূপচন্দ্র সেখানে একটি সৈন্য-শিবির স্থাপন করেছিলেন।

শিবিরটির অবস্থান ছিল জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। একদিন রাতে জৈন্তিয়ার পাহাড়ি যোদ্ধারা এই শিবিরের ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলায় রূপচন্দ্র এবং তাঁর কয়েকশ সৈন্যের প্রাণহানী

ঘটে। যারা বেঁচেছিলেন তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে বিরশ্রীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে রূপচন্দ্রের স্ত্রী-ও ছিলেন। তিনি তাঁর দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে স্বামীর সাথে সৈন্য-শিবিরেই ছিলেন। পাহাড়িদের হামলার পর তিনি দুই শিশুকে নিয়ে অন্যদের সাথে বীরশ্রীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাংলার সুলতান এই পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পাহাড়িদের হাতে রূপচন্দ্রের নির্মম মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সন্তানদের প্রতি বাংলার সুলতানের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। রূপচন্দ্রের পুত্র সর্বানন্দ দত্তচৌধুরী বড় হয়ে সিলেটের শাসনকর্তা (কানুনগো) হয়েছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নবাব সরওয়ার খাঁ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর ঘটনাটি বিভিন্ন ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলার শক্তি পত্রিকার 'পল্লীস্মৃতি' প্রবন্ধে এই ঘটনার কথা আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী।

অধ্যায় দশ
বামজঙ্ঘা মহাপীঠ

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, সত্যযুগের দেবী সতী ছিলেন মহাদেব শিবের প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন খুবই পতিভক্ত একজন নারী। কিন্তু তাঁর পিতা দক্ষ প্রজাপতি মহাদেব শিবকে মোটেও পছন্দ করতেন না। তাই দক্ষযজ্ঞের সময়ে তিনি প্রকাশ্যে শিবের নিন্দা করেন। পিতা কর্তৃক পতি অপমানের এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সতী প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তখন ক্রোধে উন্মত্ত শিব সতীর নিথর দেহ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয়নৃত্য শুরু করেন। এতে জগৎ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলে সকল দেবতার অনুরোধে জগৎপালক বিষ্ণু জগৎ রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন। সনাতন ধর্মের শাক্তরা বিশ্বাস করেন, সতীদেহের এসব খণ্ডিত অংশ ভারতবর্ষের মোট ৫১টি জায়গায় পড়েছিল। এসব স্থানকে 'শক্তিপীঠ' বা 'পীঠস্থান' বলা হয়। শাক্তদের কাছে এসব পীঠস্থান পবিত্র তীর্থস্থানরূপে গণ্য হয়ে থাকে।



চিত্র: ফালজুরের বামজঙ্ঘা মহাপীঠ

শাক্তদের বিশ্বাস, প্রতিটি পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবী এবং এর পাশাপাশি একজন রক্ষাকর্তা দেবও আছেন। পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয় 'ভৈরবী' এবং রক্ষাকর্তা দেবকে বলা হয় 'ভৈরব'। সতীর দেহের কোন অংশ কোথায় পড়েছিল তার বিবরণ জানা যায় সনাতন ধর্মীয় সাহিত্যের অন্যতম শাখা তন্ত্রশাস্ত্র থেকে। তন্ত্রশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তন্ত্রচূড়ামণিতে ভারতবর্ষের ৫১টি সতীপীঠের বিশদ বিবরণ রয়েছে। এতে প্রতিটি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁর সঙ্গী ভৈরবের নামও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সতীপীঠগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তন্ত্রচূড়ামণিই প্রধান হিন্দুশাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, সতীদেবীর বাম জঙ্ঘা বা বাম উরু পতিত হয়েছিল জয়ন্তী নামক স্থানে। তন্ত্রচূড়ামণিতে উল্লিখিত এসংক্রান্ত কিছু পঙক্তি নিম্নরূপ।

(১) জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর।
(অর্থ: জয়ন্তী নামক স্থানে দেবীর বাম জঙ্ঘা পতিত হয়েছিল। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম জয়ন্তী। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর।)

(২) বামজঙ্ঘা জয়ন্ত্যাং তু জয়ন্তী ভৈরবস্তথা
ক্রমদীশ্বরস্তত্র দেবী জাগ্রতী সর্বদা।
(অর্থ: জয়ন্তী নামক স্থানে দেবীর বাম জঙ্ঘা পতিত হয়েছিল। এখানকার দেবী জয়ন্তী এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর সর্বদাই জাগ্রত থাকেন।)

(৩) কৈলাশে দশ লক্ষ্যেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চ লক্ষত।
(অর্থ: কৈলাস পর্বতে দশ লক্ষ বার মন্ত্র পাঠে যে পূণ্য বা সিদ্ধি লাভ হয় জয়ন্তী তীর্থে পাঁচ লক্ষ বার মন্ত্র পাঠে সেই একই পূণ্য বা সিদ্ধি লাভ হয়।)

তন্ত্রশাস্ত্রের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল- কামাখ্যাতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি। এসব গ্রন্থেও জয়ন্তী শক্তিপীঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কামাখ্যাতন্ত্রে উল্লিখিত এসংক্রান্ত কিছু পঙক্তি নিম্নরূপ।

(১) কামরূপস্য দক্ষিণে শ্রীহট্টো নাম নামতঃ
তত্র জয়ন্তী দেবী চ লিঙ্গরূপী জনার্দনঃ
(অর্থ: কামরূপের দক্ষিণ ভাগে শ্রীহট্ট নামক স্থান অবস্থিত। সেখানে জয়ন্তী দেবী এবং লিঙ্গরূপে জনার্দন অবস্থান করছেন।)

(২) ত্রিপুরা কৈকিকা চৈব জয়ন্তী মণি চন্দ্রিকা

কাছাড়ী মাগধী দেবী অশ্মনি সপ্ত পর্বত।

(এই পঙক্তিদ্বয়ে উল্লিখিত ত্রিপুরা হচ্ছে প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য। কৈকিকা হচ্ছে প্রাচীন 'কৈকেয়' বা এর সংলগ্ন কোনো অঞ্চল। কৈকেয় ছিল জৈন্তিয়া বা কাছাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি প্রাচীন জনপদ। জয়ন্তী হচ্ছে প্রাচীন জৈন্তিয়া রাজ্য। মণি হচ্ছে মণিপুর রাজ্য, যা মহাভারতের যুগ থেকেই একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। চন্দ্রিকা হচ্ছে প্রাচীন চন্দ্রপুর। চন্দ্রপুর ছিল শ্রীহট্টের অংশবিশেষ। কাছাড়ী হচ্ছে বর্তমান আসামের কাছাড় জেলা বা প্রাচীন কাছাড়ি রাজ্য। মাগধী দেবী বলতে প্রাচীন মগধ রাজ্যের প্রভাব বলয়ে থাকা পূর্বাঞ্চলীয় কোনো পবিত্র স্থান বা দেবীপীঠকে বোঝানো হয়েছে। 'অশ্মনি সপ্ত পর্বত' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এ সমস্ত অঞ্চল সাতটি পর্বতমালা বা গিরিধারা দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত।)



চিত্র: বামজঙ্ঘা মহাপীঠের পাঁচ শতক পুরানো প্রাচীরের একাংশ

কামাখ্যাতন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামণির পাশাপাশি কালিকাপুরাণেও জয়ন্তী দেবীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। কালিকাপূরাণ মূলত একটি শাক্ত উপপুরাণ হলেও এতে তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর প্রভাব রয়েছে। তাই একে শাক্ত-তান্ত্রিক সাহিত্য বা তন্ত্রসাহিত্য হিসেবেও গণ্য করা হয়। এই উপপুরাণের ৬১তম অধ্যায়ের ৩৯ তম শ্লোকের অংশবিশেষ নিম্নরূপ।

"ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।"
(অর্থঃ হে দেবী, তুমি জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা। তোমাকে প্রণাম।)

তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে বারবার উল্লিখিত 'জয়ন্তী' নামক স্থানটি হচ্ছে উত্তর সিলেট ও পূর্ব মেঘালয়জুড়ে বিস্তৃত বর্তমান জৈন্তিয়া অঞ্চল যা ১৮৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্যের আদি নাম ছিল 'জয়ন্তী'। ঋষি জৈমিনি কর্তৃক রচিত 'জৈমিনি মহাভারত' গ্রন্থেও এই নামটি পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এই নামেই রাজ্যটি পরিচিত ছিল। তবে কোন কোন প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজ্যটি 'জয়ন্তীয়া' নামেও পরিচিত ছিল। ব্রিটিশরা রাজ্যটি দখল করার পরে তারা এই অঞ্চলকে 'জৈন্তিয়া' নামে উচ্চারণ করতো। তখন থেকে 'জয়ন্তী' বা 'জয়ন্তীয়া' নামের স্থলে 'জৈন্তিয়া' নামটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাই মূলগতভাবে 'জৈন্তিয়া' এবং 'জয়ন্তী' একই শব্দ।

তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভবের বহু আগে থেকেই জৈন্তিয়া অঞ্চলটি 'জয়ন্তী' নামে পরিচিত ছিল। গবেষকদের মতে, তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে। তন্ত্রচূড়ামণি, কামাখ্যাতন্ত্র ও কালিকা পুরাণের উদ্ভব ও প্রসিদ্ধি লাভের সময়কাল এর ভেতরেই। এসব শাস্ত্রে বর্ণিত জয়ন্তী দেবী সম্পর্কিত বিশ্বাস ও ধারণাসমূহও এই সময়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু জয়ন্তী রাজ্যের নাম এর বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। জৈমিনি মহাভারতের বর্ণনা থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যে (এ গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সময়কাল আরও পুরানো)। এর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

"জয়ন্তী নাম তত্রাস্তি নারীরাজ্যং মহৎ প্রিয়ম
যত্র প্রমিলা নাম রাজ্ঞী বীর্যবতী স্থিতা"

(অর্থঃ সেখানে জয়ন্তী নামে এক মহান ও প্রিয় নারীরাজ্য রয়েছে যেখানে অত্যন্ত বীর্যবতী রানী প্রমীলা রাজত্ব করতেন।)

পৌরাণিক যুগে প্রমীলা ছিলেন জয়ন্তী রাজ্যের শাসক। তিনি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটক করেছিলেন এবং মহাবীর অর্জুনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। গবেষকদের মতে, মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক ৩১০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এই যুদ্ধের পরপরই প্রমীলার সাথে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল। এর কয়েক হাজার বছর পরে জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থানের ধারণাটি প্রসিদ্ধ হয়েছিল। পীঠস্থানটি প্রকাশিত হয়েছিল আরও পরে। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)' গ্রন্থের লেখক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে, জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থানটি হয়তো তান্ত্রিক যুগেই প্রকাশিত ছিল। কোন কারণে তা ক্রমশ অজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে, খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে এটি আবারও প্রকাশিত হয়েছিল।

জৈন্তিয়ায় তখন সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের শাসন চলছে। এই জনগোষ্ঠীর রাজা প্রথম বড়গোসাঁইয়ের শাসনামলে (আনুমানিক ১৫৫০ সালের আগে) রূপনাথ নামক এক ধর্মযাজক ফালজুরের এক স্থানে জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থান অর্থাৎ বামজঙ্ঘা পীঠটি শনাক্ত করেছিলেন। বর্তমানে এই স্থানটি জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন একটি গ্রামে অবস্থিত। গ্রামটির নাম বাউরভাগ দ্বিতীয় খণ্ড। এটি বাংলাদেশের সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার লক্ষ্মীপ্রাসাদ পশ্চিম ইউনিয়নের অন্তর্গত। পীঠস্থান সংলগ্ন এলাকাটি সুরইঘাটের সনাতনপুঞ্জি নামেও পরিচিত। অতীতে এই এলাকাটি জৈন্তিয়ার ফালজুর রাজ বা পরগনার অন্তর্গত ছিল। তাই পীঠস্থানটি 'ফালজুরের বামজঙ্ঘা মহাপীঠ' নামেই পরিচিতি লাভ করে ছিল। বর্তমানে এটি শুধু 'বামজঙ্ঘা মহাপীঠ' নামেই পরিচিত। ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের বিচারে এটি বৃহত্তর সিলেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

কথিত আছে যে, রাজা বড়গোসাঁইয়ের আমলে কতিপয় রাখাল বালক এই পীঠস্থানে খেলাচ্ছলে পূজা করতে গিয়ে একটি দৈব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়। এই অদ্ভূত ঘটনার কথা রাজপুরুষগণ কর্তৃক রাজার শ্রুতিগোচর হয়। এতে রাজা তীব্র কৌতূহল বোধ করেন এবং স্বীয় গুরুদেব রূপনাথকে সঙ্গে নিয়ে ফালজুর গমণ করেন। রাজগুরু রূপনাথ একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক প্রমাণপ্রাপ্ত হয়ে বালকদের খেলাস্থলের রহস্যময়

প্রস্তরখণ্ডকে বামজঙ্ঘা পীঠ বলে শনাক্ত করেন এবং জয়ন্তীদেবীকে এর ভৈরবী বলে প্রকাশ করেন। রাজা জয়ন্তীদেবীর এই পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন এবং পীঠস্থানের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। পীঠস্থানে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পূজাও শুরু হল। প্রতি বছর এখানে নরবলি দেওয়ার প্রথাও চালু হল। জৈন্তিয়া রাজ্যের যেসব অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো তাদের মধ্য থেকেই নরবলির লোক বেছে নেওয়া হতো।



চিত্র: বামজঙ্ঘা মহাপীঠের পুরানো প্রাচীরের গায়ে বিভিন্ন নকশা

বামজঙ্ঘা পীঠ প্রকাশিত হলে এর ভৈরবের অনুসন্ধানও শুরু হয়। এক্ষেত্রে দুটি মত চালু হয়। মহাপীঠকে আঁকড়ে ধরা প্রস্তরাংশকে কেউ কেউ ভৈরব বলে চিহ্নিত করেন। এর নাম ক্রমদীশ্বর। আবার কেউ কেউ মনে করলেন, মহাপীঠ থেকে অল্প উত্তরে আবিষ্কৃত শিবই হচ্ছেন এর ভৈরব। এই শিবের নাম 'রূপনাথ শিব'। পীঠ প্রকাশক রাজগুরু রূপনাথ কর্তৃক পূজিত হওয়ার কারণেই এই

শিবের এমন নামকরণ হয়েছিল। রাজা বড়গোসাঁই এই শিবকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর দক্ষিণ পাশে একটি মন্দির নির্মাণ করলেন। কিন্তু শিবকে আর মন্দিরে নেওয়া হল না। তিনি যথাস্থানেই পড়ে রইলেন। কথিত আছে যে, শিবকে স্থানান্তরিত না করার জন্য রাজা স্বপ্নলোকে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা তাই-ই করলেন। মন্দিরটি খালি পড়ে রইল। আর স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত রূপনাথের জন্য তৃণকুটির নির্মাণের প্রথা চালু হল। এই প্রথার একটি বৈশিষ্ট্য হল, সিন্টেং রমণীরা রূপনাথের কুটির বানিয়ে দিয়ে থাকেন। পুরুষদের এই কুটির নির্মাণের অধিকার নেই। রূপনাথের এই কুটির সমতলে নয়; এটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।

[রূপনাথ শিব বামজঙ্ঘা মহাপীঠ থেকে অল্পদূরে হলেও উভয়ের অবস্থান দুই দেশে। রূপনাথ শিবের অবস্থান ভারতের অন্তর্গত জৈন্তিয়া পাহাড়ে। পাহাড়ের পাদদেশে যে সমতল গ্রাম রয়েছে সেখানেই মহাপীঠের অবস্থান। কিন্তু পাহাড়ের ঠিক নিচেই দুই দেশের সীমান্ত থাকায় উভয়ের অবস্থান দুই দেশে।]

অধ্যায় এগারো
নারতিয়াং মন্দির

জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসী সিন্টেং জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা মূলত নিয়েমত্রে বা নিয়েমট্যানরাই ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত তারা এই ধর্মেরই অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের বেলায় দেখা যায়, তারা জৈন্তিয়া সমতলের ধর্মমতসমূহ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি মেনে চললেও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা সমতলের সনাতন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে প্রথমদিকের সিন্টেং রাজারা একপ্রকার মিশ্র ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এর কারণ, তারা সনাতন ধর্মের পাশাপাশি আদি নিয়েমট্যানরাই ধর্মেরও কিছু রীতিনীতি পালন করতেন। রাজা যশোমাণিক ছিলেন প্রথম সিন্টেং রাজা যিনি পুরোপুরিভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৬০৫ সালে জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। এর দু-তিন বছর পর (আনুমানিক) তিনি কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সনাতনধর্মের কঠোর অনুসারী এই রাজকন্যার প্রভাবে রাজা যশোমাণিকও সনাতন ধর্মের প্রতি গভীরভাবে ঝুঁকে গিয়েছিলেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, যশোমাণিক জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পর সুকৌশলে আহোম ও কাছাড়ি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলেন। ১৬০৬ সালে এই যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল। ওই বছরের একেবারে শেষের দিকে কাছাড়ি রাজা শত্রুদমনের সৈন্যরা আহোমদের হাত থেকে 'রহা' নামে একটি দূর্গ জয় করে। এ ঘটনাটিই ছিল আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধের শেষ ঘটনা। প্রতিবেশীদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হলে রাজা যশোমাণিক নিশ্চিন্ত মনে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কোচবিহার রাজ্য ভ্রমণে গিয়ে তিনি সেখানকার রাজকন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই রাজকন্যা ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ। কোচ রাজপরিবারের অন্যদের মতো তিনিও সনাতন ধর্মের কঠোর অনুসারী ছিলেন। যশোমাণিক এই নববধূকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফেরত আসার সময় শশুরালয় থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত একটি ধাতব মূর্তিও সঙ্গে এনেছিলেন। এই মূর্তিটিকে তিনি রাজধানী জয়ন্তীপুরে স্থাপন করেছিলেন।

এরপর তিনি জৈন্তিয়া পাহাড়ের দিকে মনোযোগ দেন। জৈন্তিয়া পাহাড়ের নারতিয়াং গ্রামটি ছিল তাঁর উপ-রাজধানী বা গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। তিনি সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করলেন। কথিত আছে, একদা রাজা স্বপ্নযোগে শক্তি দেবী দুর্গার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই সাক্ষাতে দেবী তাকে নারতিয়াংয়ের একটি পবিত্র স্থান দেখিয়ে সেখানে পূজা দেওয়ার কথা বলেন। দেবী তাকে আরও বলেন যে, এই পবিত্র স্থানটি একটি পীঠস্থান। যশোমাণিক দেবীর কথা অনুযায়ী সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর সেখানে নরবলি দেওয়ার প্রথাও চালু হয়। প্রতি বছর জৈন্তিয়ার রাজদরবারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দু-একজন আসামীকে এই মন্দিরে এনে বলি দেওয়া হতো। জৈন্তিয়া পাহাড়ে স্থাপিত প্রথম সনাতনী মন্দির এটিই। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, এই মন্দিরটি একটি উপপীঠ। এখানে সতী দেবীর বামজঙ্ঘা বা বামউরুর একটি অংশ পতিত হয়েছিল। এই উপপীঠের ভৈরবী হচ্ছেন জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবী আর ভৈরব হচ্ছেন ক্রমদীশ্বর।



চিত্রঃ নারতিয়াং মন্দির

গুরুত্বের বিচারে এটি জৈন্তিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্দির। ব্রিটিশ আমলের আগে এখানে নরবলি দেওয়ার প্রচলন ছিল। সেই ধর্মীয় রীতির অনুসরণে এখনও এখানে মানুষের পোষাক পরিয়ে পাঠা বলি দেওয়া হয় (প্রতি বছর শারদীয় উৎসবের সময় পাঠা বলিদানের আয়োজন করা হয়)। অদ্ভূত ব্যাপার হল, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই মন্দিরে কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই। এখানকার পুরোহিত হলেন ক্ষত্রিয়। শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষত্রিয় পুরোহিতগণ এই মন্দিরের সেবা করে আসছেন। কয়েকশ বছর আগের প্রথম পুরোহিতের বংশধররা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন। তাদের বংশের ইতিহাস অনুযায়ী, জৈন্তিয়ার রাজা যশোমাণিক এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মহারাষ্ট্র থেকে ক্ষত্রিয় বর্ণের একজন মারাঠা পুরোহিতকে (তাদের আদিপুরুষ) এনে এখানে নিযুক্ত করেছিলেন।

২০১৮ সালে এই মন্দিরের পুরোহিতের একটি সাক্ষাৎকার ধারণ করেন জৈন্তিয়া রাজ্যের পুরাকীর্তিসমূহের চিত্রধারণের কাজে অভিজ্ঞ আলোকচিত্রী মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম। তাকে মন্দিরের পুরোহিত জানান যে, তিনি প্রথম মারাঠা পুরোহিতের ত্রিশতম অধঃস্তন বংশধর হিসেবে মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ প্রথম মারাঠা পুরোহিতকে এই মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন রাজা যশোমিণিক। তিনি আরও বলেন যে, এই মন্দিরটি একটি পীঠস্থান এবং এর ভৈরবী হচ্ছেন জয়ন্তী দেবী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবী; এখানে প্রতি বছর দেবীর উদ্দেশ্যে পাঠা বলি দেওয়া হয়ে থাকে। মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম মন্দিরের ভেতরের যেসব চিত্রধারণ করেছেন তাতে দেখা যায়, একটি বেদীর উপরে কয়েকটি ধাতব মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। তাঁর মতে, এসব মূর্তির মধ্যে সেই মূর্তিটিও রয়েছে যা রাজা যশোমাণিক তাঁর শশুরবাড়ি থেকে উপহার পেয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজ্যের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, এই মতটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ।

ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজা যশোমাণিক তাঁর শশুরের রাজ্য থেকে প্রাপ্ত মূর্তিটিকে রাজধানী জয়ন্তীপুরেই (বর্তমান নিজপাট) স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এখানে এমন কোন মূর্তি বা মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। নিজপাট থেকে এই মূর্তিটির অন্তর্ধানের পেছনে প্রকৃত ঘটনা কী ছিল তা খুঁজে পাওয়া যায় রাজা যশোমাণিকের সময়কালের পরবর্তী শতকে সংঘটিত জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের ইতিহাসে। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৭০৮ সালে। ওই

বছরের প্রথমদিকে জৈন্তিয়ার রাজধানী দখলের পর আহোম সৈন্যদের একটি দল মূর্তিটিকে আহোমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা এটিকে সাথে নিয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গোভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই যাত্রা সফল হয়নি। যাত্রাপথে তারা জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মারাত্মক আক্রমণের মুখে পড়ে।



চিত্র: নারতিয়াং মন্দিরের ভেতরে স্থাপিত ধাতব মূর্তিসমূহ

আক্রমণে তাদের অনেকেই নিহত হয়। বাকীরা প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে মূর্তিটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এই পলাতক সৈন্যরা কিছুদিন নারতিয়াং পুঞ্জিতে আশ্রয় নেওয়ার পর আবারও গোভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু এবারেও তারা আক্রমণের শিকার হয় এবং তাদের বেশিরভাগই নিহত হয়। এরপর জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধারা নারতিয়াং পুঞ্জিতে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। ১৭০৮ সালের এপ্রিল মাসে এই যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান হয়েছিল। আহোমের বুরুঞ্জীতে বর্ণিত এসব তথ্য থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, আহোম সৈন্যরা মূর্তিটি ফেলে চলে যাওয়ার পর সেটি জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরই হস্তগত হয়েছিল এবং নারতিয়াং পুঞ্জিতে ঘাটি স্থাপনের সময় তারা মূর্তিটিকে সেখানকার মন্দিরেই স্থাপন করেছিল। তখন থেকে আজ অবধি মূর্তিটি সেখানেই আছে।

ব্রিটিশ গবেষক স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্য দিয়েছেন। গ্রন্থটির একাদশ অধ্যায়ে তিনি মূর্তিটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "This image is known to have been in Jaintapur at the time of the Ahom conquest in 1708." (*A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page-263) মূর্তিটি কীভাবে জৈন্তাপুর থেকে গায়েব হয়ে গেল সে ব্যাপারে তিনি একই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্ট তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "These measures caused the greatest possible irritation amongst the Jaintia nobles. …they induced the Bar Dalai, the Raja of Khairam, and the inhabitants of two hundred independent Khasi villages to join them in a supreme effort to expel the invaders. …Three of these forts were taken unawares and were captured by the Jaintias, who put the defenders to death. …At the same time a small detachment, which was taking the copper image of the Goddess Jaintesvari to Rudra Singh, was attacked and put to flight and the image was rescued. (*A HISTORY OF ASSAM*, 1926, Page-178)

জয়ন্তী দেবীর উপপীঠ খ্যাত নারতিয়াং মন্দিরটি সনাতন ধর্মের মন্দির হলেও স্থানীয় সিন্টেংদের কাছে তা অত্যন্ত পবিত্র বলেই বিবেচিত হয়। স্থানীয় সিন্টেংদের আদি ধর্মবিশ্বাসের সাথে সনাতন ধর্মের সংমিশ্রণের প্রতীক হচ্ছে এই মন্দির। সিন্টেংদের আদি ধর্মে (নিয়েমত্রে বা নিয়েমট্যানরাই) জয়ন্তী দেবীর উপাসনার কোন প্রচলন ছিল না। কিন্তু সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে নারতিয়াং মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, নারতিয়াং পুঞ্জিতে বসবাসরত সিন্টেংরা জয়ন্তী দেবীর পূজায় অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন। এর মূলে ছিল মন্দিরটির প্রভাব। স্থানীয় সিন্টেংরা এই মন্দিরটিকে নিজেদের মন্দির হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাই স্থানীয়ভাবে এটি হয়ে উঠেছিল সনাতন এবং নিয়েমট্যানরাই উভয় ধর্মাবলম্বীদের মন্দির। তবে পুরো জৈন্তিয়া পাহাড়ের সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মন্দিরটি খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি। সিন্টেংরা তাদের আদি ধর্মই পালন করতো। ব্রিটিশ আমলে তাদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে। বর্তমানে তাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী।

অধ্যায় বারো
জৈন্তিয়া রাজবাড়ি

সুপ্রাচীনকাল থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল জয়ন্তীপুর (বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলা সদর)। দ্বাদশ শতক থেকে জৈন্তিয়ার রাজারা এখানে বসবাস করতেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। ১৫০০ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যটি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তারাও জয়ন্তীপুরেই বসবাস করতেন (জৈন্তিয়া পাহাড়ের নারতিয়াং পুঞ্জিতে তাদের একটি উপ-রাজধানী থাকলেও তারা মূল রাজধানীতেই বসবাস করতেন)। নিজ জনগোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্থ হওয়ায় সিন্টেং রাজারা কোন জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ বা রাজবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজন বোধ করেননি। আনুমানিক ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত রাজারা জয়ন্তীপুরের একটি সাধারণ বাড়িতেই বসবাস করতেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই বাড়িটি ছিল পাথরে নির্মিত একটি বসতবাড়ি। এর অবস্থান ছিল বর্তমান জৈন্তাপুর মডেল থানার পেছনে। ব্রিটিশ আমলে বাড়িটির স্থলে একটি থানা ও ডাক-বাংলো নির্মিত হওয়ায় সেটির কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির ইন্দারা

আনুমানিক ১৭৬৫ সালে জৈন্তিয়া রাজ্যের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের ভাগিনেয় ফতেহ খাঁ। রাজা বড়গোসাঁইয়ের অত্যাধিক স্নেহের পাত্র হওয়ায় এই তরুণ সেনাপতি পুরো রাজ্যেরই হর্তাকর্তা বনে গিয়েছিলেন। রাজা তাঁর হাতে পুরো রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তোলে দিয়েছিলেন। এই সুবাধে তিনি জয়ন্তীপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ নেন। তাঁর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আনুমানিক ১৭৬৫-৬৬ সালে জয়ন্তীপুরের কেন্দ্রস্থলে একটি নতুন রাজবাড়ি নির্মিত হয়। এই বাড়িটি ছিল অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও জাঁকজমকপূর্ণ। একটি অনুচ্চ টিলার উপরে বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। টিলার উপরিভাগ কেটে বিস্তৃত সমতল জায়গা প্রস্তুত করে সেখানে বাড়ির বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছিল। স্থাপনাসমূহকে সুরক্ষিত করার জন্য বাড়ির চারপাশে একটি প্রাচীরও নির্মাণ করা হয়েছিল।

বাড়ির সদর দরজা বা প্রধান ফটক ছিল দক্ষিণপাশে। নিচের সমতলভূমির সাথে টিলার উপরের এই ফটকটিকে সংযুক্ত করেছিল একটি পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়িটি মোটেও খাড়া ছিল না। এটি বেশ আনুভূমিক ছিল। নিচ থেকে চৌদ্দটি প্রশস্ত ধাপ ক্রমশ উপরে উঠে গিয়ে প্রধান ফটকের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ির প্রধান ফটক পার হলেই তিন কক্ষ বা কামরা বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ চোখে পড়তো। প্রাসাদের প্রথম কক্ষটি মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যারা রাজবাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করতেন তারা এই কক্ষেই থাকতেন। পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন রাজের (পুঞ্জি ও পরগনা) প্রধানগণ এবং গোভা ও ডিমারুয়ার মতো সামন্ত রাজ্যের প্রধানগণ মাঝেমধ্যে রাজবাড়ির অতিথি হতেন। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও কোন প্রয়োজনে জয়ন্তীপুরে আসলে রাজবাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করতেন। তাদের বিশ্রামের জন্য রাজবাড়ির প্রাসাদের প্রথম কক্ষটি ছেড়ে দেওয়া হতো।

প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষটি সদর মহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে শুধু রাজা থাকতেন। যেসব রাজারা বিবাহিত ছিলেন তাদের সাথে রানীরাও সদর মহলে থাকতেন। প্রাসাদের তৃতীয় কক্ষটি অন্দর মহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে সাধারণত রাজার বোন (রাজকুয়ঁরী) ও ভগ্নিপতি থাকতেন। এই তিনটি কক্ষ ছাড়াও রাজবাড়িতে বসবাসের জন্য আরও কিছু কক্ষ ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা নির্মিত এসব কক্ষ ছিল মূল প্রাসাদের বাইরে। বাড়ির অন্যান্য

স্থাপনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি পারিবারিক মন্দির। কালের গ্রাসে বাড়ির মূল প্রাসাদ ও প্রাচীর হারিয়ে গেলেও এই মন্দিরটি আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা এই মন্দিরটি আজও রাজবাড়ির বাসিন্দাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজবাড়ির একটি পানির কূপ বা ইন্দারাও টিকে আছে। দক্ষিণের একটি ফটকও টিকে আছে। কয়েক বছর আগেও মন্দির ও ইন্দারার কাছে একটি ছোট ফটকের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে এটি নেই। এই ছোট ফটক সংলগ্ন অনুচ্চ দেয়ালের কিছুটা এখনও চোখে পড়ে।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির একটি ফটক

আপাতদৃষ্টিতে বিশেষত্বহীন এই বাড়িটি ছিল একসময়কার জয়ন্তীপুরের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি। রক্ষীরা এই বাড়িটি পাহারা দিত। সবসময় এখানে লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। আনুমানিক ১৭৬৬-৬৭ সালের দিকে বাড়িটিতে রাজপরিবারের বসবাস শুরু হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় বড়গোসাঁই ছিলেন এই বাড়ির প্রথম বাসিন্দা। বাড়িটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরপরই তিনি পুরানো রাজবাড়ি ছেড়ে সপরিবারে

এখানে পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতেই ছিলেন। এরপর তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে জৈন্তিয়া পাহাড়ের লখডং পুঞ্জিতে চলে যান। নতুন রাজা হিসেবে তখন রাজ্যের ক্ষমতায় আসেন ছত্রসিংহ। তিনি ও তাঁর পরিবার ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত নতুন রাজবাড়িতে বসবাস করেন। ছত্রসিংহের পর ক্রমশ রাজা যাত্রানারায়ণ (১৭৭৪-১৭৮৫ সাল) ও বিজয়নারায়ণ (১৭৮৫-১৭৮৮ সাল) সপরিবারে এই বাড়িতে বসবাস করেছিলেন।

রাজা বিজয়নারায়ণের সময়ে নারতিয়াং পুঞ্জির দলইয়ের পুত্র লক্ষ্মীসিংহ এই বাড়িতে ঘন ঘন আসতেন। রাজপরিবারের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাধে তিনি রাজসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। এরপর নানান নাটকীয়তার পর তিনি সীমিত সময়ের জন্য জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। তখন তিনি রাজবাড়িতেই বসবাস করতেন। এরপর রাজা হন দ্বিতীয় রামসিংহ। তিনি ১৭৯০ সাল থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। ফতেহ খাঁ নির্মিত রাজবাড়ির সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের (৪২ বছর) বাসিন্দা ছিলেন তিনিই। তাঁর পরের রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ছিলেন জৈন্তিয়ার শেষ রাজা (তিনি ইন্দ্র সিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন)। ১৮৩৫ সালে তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। তখন থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়িতে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। এই হতভাগা রাজা যখন ব্রিটিশদের হাতে বন্দী ছিলেন তখন তাঁর পরিবারের লোকজন রাজবাড়িতেই বসবাস করতেন।

১৮৩৫ সালে রাজপরিবারটির আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা নিরূপায় হয়ে রাজবাড়ির দক্ষিণে (রাজবাড়িতে উঠার সিঁড়ির বিপরীতে) একটি হাট সৃষ্টি করেছিলেন। এটি আজও জৈন্তাপুর সদরের প্রধান হাট-বাজার হিসেবে প্রসিদ্ধ। আনুমানিক ১৮৩৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গৃহবন্দী রাজার ভগ্নিপতি উখাট কুওর ও লংবর কুওর এই হাট প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাহাড় ও সমতলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও এই হাট প্রতিষ্ঠায় রাজপরিবারকে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। হাটে পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতারা যে আয় করতেন তার ক্ষুদ্র একটি অংশ রাজপরিবারকে দিতেন। সাধারণত সপ্তাহে একদিন এই হাট বসতো। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত রাজপরিবারটি হাটের আয় ও ব্রিটিশ সরকারের সামান্য ভাতার ওপর নির্ভর করে টিকেছিল। জৈন্তিয়া

দখলের পরে ব্রিটিশ সরকার রাজপরিবারের দূরবস্থার দিকটি বিবেচনা করে বন্দী রাজা ও তাঁর পরিবারের জন্য একটি মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির মন্দির

১৮৬১ সালে বন্দী রাজার মৃত্যুর পর রাজপরিবারের অভিভাবক হন তাঁর ভাগিনেয় নরেন্দ্র সিংহ। তিনিও ব্রিটিশ সরকারের ভাতা পেতেন। একজন 'প্রতীকী রাজা' হিসেবে তিনি রাজবাড়িতেই বসবাস করতেন। তখন রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁর দুটি নাবালক ভাগিনেয় তাঁর সঙ্গে রাজবাড়িতে বসবাস করতো। এদের নাম ছিল নরসিংহ নৃপ ও ছত্রসিংহ নৃপ।

এছাড়া রাজপরিবারে আর কেউ ছিলেন না। নরেন্দ্র সিংহের বোন ও ভগ্নিপতি (শিশু দুটির মাতাপিতা) জীবিত ছিলেন না। তিনি নিজে ছিলেন অবিবাহিত। ১৮৮৫ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হলে শিশু দুটি অসহায় হয়ে পড়ে। তখন সিলেটের জজ বাহাদুর নিজ অভিভাবকত্বে তাদেরকে সিলেট শহরে নিয়ে যান। তারা সেখানে তাঁর আশ্রয়ে থেকে বড় হয় ও শিক্ষা গ্রহণ করে। সাবালক হওয়ার পর ১৮৯৭ সালে তারা রাজবাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু রাজবাড়িটি তখন আর অক্ষত ছিল না।

১৮৯৭ সালের ১২ জুন ছিল বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলের ইতিহাসের এক ভয়ংকর দিন। ৮.৭ মাত্রার এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে সেদিন সিলেট ও আসাম অঞ্চলের বড় বড় প্রাচীন স্থাপনাসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জৈন্তিয়া অঞ্চল ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের বেশ কাছাকাছি একটি অঞ্চল। জৈন্তিয়ার বেশিরভাগ পুরানো স্থাপনাই ভূমিকম্পের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজবাড়িটিরও একই দশা হয়েছিল। ভূমিকম্পে বাড়ির মূল প্রাসাদটির ছাদ ধ্বসে গিয়েছিল। মন্দিরসহ বাড়ির ছোট স্থাপনাসমূহ অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল। নরসিংহ নৃপ ও ছত্রসিংহ নৃপ সিলেট শহর থেকে ফিরে আসার পর বাড়ির এক কোণায় একটি ঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৯১০ সালে নরসিংহ নৃপের মৃত্যু হলে রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাকি থাকেন শুধু ছত্রসিংহ নৃপ। তিনি নরসিংহ নৃপের মতো অবিবাহিত না থেকে ত্রিপুরা রাজপরিবারের এক কন্যাকে বিয়ে করেন।

এই বিয়েটি বেশ আড়ম্বরপূর্ণ হয়েছিল। জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতলের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিয়ের দিন রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। পাহাড় ও সমতলের লোকজন ছত্রসিংহ নৃপকে প্রতীকী রাজার মর্যাদা দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও এর স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী বা প্রতীকী রাজা হিসেবে তিনি ১৯১৪ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকারের মাসিক ভাতা পেতে শুরু করেন। তাঁর দুই কন্যার নাম ছিল মলিনা দেবী ও ইরা দেবী। মলিনা দেবীর বিবাহ হয়েছিল রংপুরের বিনয়ভূষণ রায়ের সাথে। কনিষ্ঠ কন্যা ইরা দেবীর বিবাহ হয়েছিল শিলচর নিবাসী কাছাড়ি রাজপরিবারের জন্মজয় বর্মণের সাথে। পিতৃভূমির প্রতি এই রাজকন্যার খুবই টান ছিল। ১৯৩৮ সালে ছত্রসিংহ নৃপের মৃত্যুর পর রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে শুধু তিনিই রাজবাড়িতে

থাকতেন (মলিনা দেবী স্বামীর সঙ্গে থাকতেন)। এই বাড়ির শেষ বাসিন্দা তিনিই।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙ্গে দুই দেশের সৃষ্টি হলে ইরাদেবীর নিজের বাড়ি ও শশুরবাড়ি দুই দেশে পড়ে যায়। তাঁর স্বামী চাকুরিসূত্রে ভারতের শিলং শহরে অবস্থান করতেন। দেশভাগের পর ইরাদেবী শিলং ও জয়ন্তীপুর- উভয় স্থানেই থাকতেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৬৫ সালে জয়ন্তীপুরের রাজবাড়িতে লম্বা সময় কাটিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজবাড়ির ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। এখানে আর কেউ কখনও বসবাস করেনি। বর্তমানে এই রাজবাড়ির মূল অংশ ছাড়া বেশিরভাগ অংশেই বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠেছে। মূল অংশটি বেশ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। রাজবাড়ির পুকুরটিও একসময় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারি উদ্যোগে খননের পরে পুকুরটি আবারও ব্যবহারযোগ্য হয়েছে। পুকুরটির অবস্থান রাজবাড়ির দক্ষিণের হাট-বাজারের পূর্বপাশে। যতোদিন রাজবাড়িতে লোকজনের বসবাস ছিল ততোদিন তারা এই পুকুরটিই ব্যবহার করতেন।

অধ্যায় তেরো
সেনাপতি ফতেহ খাঁ-র মোকাম

রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের শাসনামলে জৈন্তিয়া ছিল মোগলানের মিত্র রাজ্য। উভয় রাজপরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। মোগলানের নবাব আলীবর্দি খাঁ-র ভাতিজা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ ছিলেন জৈন্তিয়াপতির ভগ্নিপতি। নওয়াজিশ ছিলেন আলীবর্দি খাঁ-র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা নিজামতের শাসনকর্তা। ১৭৪০ সালে আলীবর্দি খাঁ তাকে ঢাকার নবাব (নায়েবে নাজিম) নিযুক্ত করেছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি সন্ধিপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জৈন্তিয়াপতির বোন ভৈরবী কুয়ঁরীকে বিবাহ করেছিলেন। এই আত্মীয়তার সুবাধে জৈন্তিয়া ও মোগলানের মধ্যে একটি কার্যকর মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আনুমানিক ১৭৪১ সাল থেকে এই সুসম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। নওয়াজিশের সাথে ভৈরবী কুয়ঁরীর বিবাহের পরবর্তীতে তাদের ঘরে একটি পুত্রসন্তানেরও জন্ম হয়েছিল। এই সন্তানের নাম ছিল ফতেহ খাঁ।

১৭৫৫ সালে নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ-র আকস্মিক মৃত্যু হয়। এর পরের বছর, ১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দী খাঁ-ও মারা যান। নওয়াজিশ এবং আলীবর্দি খাঁ-র মৃত্যুতে মোগলানে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়। নতুন নবাব হয়েছিলেন আলীবর্দী খাঁ-র দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু প্রবল গৃহবিবাদ ও নানামুখী ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। নানা ষড়যন্ত্রের পরিণামে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে এবং মোগলানের স্বাধীনতার সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়ে যায়। মোগলানে শুরু হয় ব্রিটিশদের প্রবল দুঃশাসন ও বেপরোয়া শোষণ-লুণ্ঠন। ব্রিটিশ অধিকৃত মোগলানের অনেকেই তখন স্বাধীন রাজ্য জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। এর কারণ, ব্রিটিশদের হাতে মোগলানের পতনে মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন।

আনুমানিক ১৭৬৫ সালে নওয়াজিশের বিধবা স্ত্রী ভৈরবী কুয়ঁরী, তাঁর পুত্র ফতেহ খাঁ এবং মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত দরবেশ হযরত কাশিম শাহসহ বেশকিছু লোকজন মোগলান থেকে জৈন্তিয়ায় পাড়ি জমান। রাজা বড়গোসাঁই নিজের বোন ও ভাগিনেয়কে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তাদের সাথে আগত সকলের জন্য তিনি বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন। কিছু লোককে

তিনি রাজ্যের উচ্চ পদেও বসিয়েছিলেন। তবে ফতেহ খাঁ-কে তিনি যে সমাদর করেছিলেন তার তুলনায় বাকি সবকিছুই তুচ্ছ। এই তরুণ যুবককে তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ বিষয়দার অর্থাৎ সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলেছিলেন। এমনকি পরোক্ষভাবে তাঁর হাতে পুরো রাজ্যেরই নিয়ন্ত্রণ তোলে দিয়েছিলেন। ফতেহ খাঁ-র পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন সিদ্ধান্তই নিতেন না এবং রাজসভাতেও ফতেহ খাঁ-র মতামত ছাড়া অন্য কারো মতামত শুনতেন না।

এ প্রসঙ্গে 'জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস' পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বলেছেন, "রাজা আপন ভগিনী ও ভাগিনাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহাদের বসবাসের জন্য স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া ফতেখাঁকে স্বীয় সেনাপতির পদে বরণ করিয়া লইলেন। ...রাজা তাহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; এমনকি তাহার পরামর্শ ব্যতিত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না।" একই প্রসঙ্গে সৈয়দ মূর্তাজা আলী তাঁর 'হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি (ফতেহ খাঁ) বড়গোসাঁইর প্রিয়পাত্র ছিলেন ও রাজা তাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন।" ফতেহ খাঁ-র হাতে রাজ্যের সকল ক্ষমতা চলে যাওয়ায় রাজসভার সদস্যদের একটি অংশ তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। এরা যেকোন মূল্যে ফতেহ খাঁ-র প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তারা ভেবে দেখল, যদি রাজাকে ফতেহ খাঁ-র প্রতি সন্দিহান করে তোলা না যায় তাহলে কোনভাবেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

তাই তারা এক গভীর চক্রান্তের পথ বেছে নিল। তারা সম্মিলিতভাবে রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, ফতেহ খাঁ রাজাকে হত্যা করে নিজে রাজা হওয়ার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। রাজা তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত এসব আমাত্যদের কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। রাজা ভাবলেন, দীর্ঘদিনের পরিচিত ও বিশ্বস্ত এতো লোক যখন ফতেহ খাঁ-র বিরুদ্ধে বলছে তাহলে নিশ্চয়ই এর পেছনে সত্যতা রয়েছে। তাই এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ফতেহ খাঁ-কে ক্ষমতাচ্যুত করেন ও হত্যার আদেশ দেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মূর্তাজা আলী লিখেছেন, "...তিনি বড়গোসাঁইর প্রিয়পাত্র ছিলেন ও রাজা তাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। ফতেহ খানের প্রতিপত্তি দেখে হিন্দু আমাত্যরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁরা প্রচার করেন যে ফতেহ খান সিংহাসনে আরোহণের ষড়যন্ত্র করছেন। রাজা আমাত্যদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফতেহ খাঁ-কে হত্যার আদেশ দেন।"

ফতেহ খাঁ-র পতন ও মৃত্যু নিয়ে অবশ্য প্রচুর ভিন্ন বর্ণনাও পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় দাবি করা হয়, কুচক্রীরা ফতেহ খাঁ-কে ধ্বংস করার জন্য ধর্মভীরু রাজাকে দেবীর অভিশাপের ভয় দেখিয়ে কাবু করেছিল। এজন্য তারা ফতেহ খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের আজানের শব্দে দেবীর মূর্তি পড়ে যাওয়ার গুজব ছড়িয়েছিল। রাজা এই গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং দেবীর কোপানলে পড়ার ভয়ে ফতেহ খাঁ-কে মসজিদ উঠিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এই বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন। 'জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস' পুস্তকে তিনি লিখেছেন, "...হিন্দুনেতাগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া রাজাকে ফতেখাঁর প্রতি প্রকুপিত করিবার জন্য ছলনা বাক্যে বলিলেন, 'রাজন। মুসলমানেরা মসজিদে আজান ধ্বনি করা কালে জৈন্তীশ্বরী দেবী স্বীয় আসন হইতে পড়িয়া যান। সুতরাং এই স্থান হইতে মসজিদ স্থানান্তরিত না করিলে দেবীর অবমাননা হইবে।' অতএব সত্বর এস্থান হইতে মসজিদ উঠাইয়া নেওয়ার আদেশ করা হউক। এতভিন্ন ফতেখাঁ সেনাপতি মহারাজের অহিত সাধনে সতত তৎপর ইত্যাদি নানা কুমন্ত্রণা দ্বারা রাজাকে ফতেখাঁর প্রতি সন্দিহান করিয়া তুলিলেন। মহারাজ বিদ্বেষিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া ফতেখাঁকে মসজিদ উঠাইয়া নেওয়ার আদেশ করিলেন। ... বীর সেনাপতি কোনক্রমেই রাজার এই অন্যায় আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাজ আদেশে মুসলিম-তিলক ফতেখাঁ সেনাপতির শিরচ্ছেদ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের চিহ্ন পর্য্যন্তও রহিল না।"

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের এই বর্ণনার একটি তথ্য বাস্তবতার সঙ্গে মিলে না। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, কুচক্রীরা রাজাকে বোঝায় যে, ফতেহ খাঁ-র মসজিদের আযানের শব্দে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু ওই সময়ে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি জয়ন্তীপুরে ছিল না। ১৭০৮ সালে এই মূর্তিটি জয়ন্তীপুর থেকে অনেক দূরবর্তী নারতিয়াং মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এতে মনে হয় যে, হয়তো জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তি নয়, অন্য কোন মূর্তিকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। আরেকটি ব্যাপার হল, যেখানে ফতেহ খাঁ-র মসজিদ ছিল সেখানে হযরত কাশিম শাহের খানকাহও ছিল। এই খানকাহের মধ্যে সবসময় উচ্চস্বরে যিকির-আযকার ও কুরআন পাঠ চলতো। আযানের শব্দের চেয়ে এসব শব্দই বেশি শুনা যেতো। এমতাবস্থায় শুধু আযানের শব্দেই দেবী পড়ে যাওয়ার কথাটি কেন রাজা বিশ্বাস করতে গেলেন তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

কুচক্রীরা রাজাকে কী বুঝিয়েছিল তা নিয়ে অভিন্ন বর্ণনা না মিললেও তিনি যে তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফতেহ খাঁ-কে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন তা সকল বর্ণনাতেই উঠে এসেছে। এই ঘটনা আনুমানিক ১৭৬৭ সালের। হত্যার পর ফতেহ খাঁ-কে রাজধানীর একটি নিভৃত স্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। বর্তমানে এই সমাধিটি 'ফতেহ খাঁ-র মোকাম' নামে পরিচিত। এর অবস্থান সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের আওতাধীন এলাকার ভেতরে। এই এলাকায় আরও কয়েকটি মোকাম রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন দরবেশের মোকাম। এরা হযরত কাশিম শাহের সঙ্গী বা খলিফা বলেই অনুমেয়। সরকারি অর্থায়নে সবগুলো মোকামকেই নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। ফতেহ খাঁ-র মোকামটিও নবনির্মিত। মূল মোকামের কোন চিহ্ন এখন আর নেই। খুব সম্ভবত, রাজা বড়গোসাঁই নিজেই ফতেহ খাঁ-র মূল মোকামটি বানিয়ে দিয়েছিলেন।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ-র মোকাম (নবনির্মিত)

ফতেহ খাঁ-কে হত্যার পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাজধানীর বন্দরহাটিতে একটি রাজকীয় মসজিদ বানিয়ে দিয়েছিলেন। এতেও তাঁর অনুশোচনা দূর হয়নি। তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। রাজ্য পরিচালনায় তাঁর আর কোন উৎসাহ ছিল না। ওই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ' গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, "কথিত আছে, অনুতপ্ত বড়গোসাঁই

কাশিম শাহের নিকট কোরআন শরীফ শিখতে চেয়েছিলেন। তখন হিন্দু পুরোহিতগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। রাজা তখন মানসিকভাবে বিপর্য্যস্ত।” এমতাবস্থায় প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী লীলাপুরী স্বামী জৈন্তিয়ায় আগমন করেন। তিনি রাজাকে রাজত্ব ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাজা এই পরামর্শ মেনে সন্ন্যাস জীবনে চলে গেলেন। ১৭৭০ সালে তিনি ভাগিনেয় ছত্রসিংহের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ের লখডং পুঞ্জিতে চলে যান। বাকি জীবন তিনি সেখানেই আধ্যাত্মিক সাধনা করে কাটিয়েছিলেন।

অধ্যায় চৌদ্দ
মোকামবাড়ি

১৭৬০ এর দশকে ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলা থেকে যারা জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই মুরশিদ বা আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন হযরত মোহাম্মদ কাশিম শাহ মুর্শিদাবাদী (রাহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দরবেশ, ইসলামী পণ্ডিত এবং বাংলার নবাব পরিবারের ধর্মীয় উস্তাদ। ব্রিটিশদের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা উদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি রণাঙ্গনেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশরাই বিজয়ী হয়েছিল। তাই বাংলার মোগল শাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের মতো তিনিও বাংলা থেকে হিযরত করেছিলেন। নিরাপদ গন্তব্যস্থল হিসেবে তিনি স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যকেই পছন্দ করেছিলেন। জীবনের বাকি অংশ তিনি এখানেই কাটিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজদরবারের বিচারকের পাশাপাশি তিনি এখানে খানকাহ ও দরসখানা পরিচালনা করতেন এবং রাজকীয় মসজিদের ইমামতিও করতেন। এখানকার রাজপরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। নাগরিকদের মধ্যেও তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

আনুমানিক ১৭৬৫ সালে হযরত কাশিম শাহ সপরিবারে জৈন্তিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তখন জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বড়গোসাঁই। এই রাজা বাংলা থেকে আগত সকলকেই তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং আয়-উপার্জনের জন্য ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করেছিলেন। তবে হযরত কাশিম শাহকে তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাজা এই ধর্মপ্রচারকের সুবিধার জন্য রাজদরবারের ঠিক পাশেই একটি বিশাল জায়গা দান করেন এবং সেখানে একটি ঘরও বানিয়ে দেন। তাঁকে জৈন্তিয়ার রাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুর মর্যাদাও প্রদান করা হয়। মুসলমান নাগরিকদের কোন বিষয় রাজদরবারে নিষ্পত্তির প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে হযরত কাশিম শাহের কাছ থেকেই ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। তিনি সরাসরি রাজদরবারে বসেই বিভিন্ন বিচারিক কাজের প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা রায় প্রদান করতেন। রাজদরবারের বিচারকাজে সহায়তার এই দায়িত্বটি ছিল একটি রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

রাজা বড়গোসাঁই হযরত কাশিম শাহকে যে জায়গা বা বাড়ি (রাজদরবারের নিকটে) দান করেছিলেন তা জনসাধারণের কাছে 'মোকামবাড়ি' নামে পরিচিতি

পেয়েছিল। বাড়ির একপাশের একটি প্রাচীন মোকামের অস্তিত্ব থাকায় হযরতের বাড়িটি এই নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। মোকামে শায়িত ব্যক্তিদের সাথে হযরতের কোন পারিবারিক সম্পর্ক নেই। তিনি জয়ন্তীপুরে আসার আগে থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। রাজকীয় ও দৃষ্টিনন্দন এই মোকামটির দিকে তাকালেই মনে হয় যে, এটি কোন সাধারণ লোকের মোকাম নয়। যে বা যারা এখানে শায়িত আছেন তারা সমসাময়িক রাজার কাছে বেশ সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য ছিলেন। অন্যথায় তাদেরকে রাজদরবারের পাশে সমাহিত করা হতো না এবং রাজকীয় শৈলীতে তাদের মোকামও নির্মিত হতো না। কিন্তু তারা কে ছিলেন সে ব্যাপারে জৈন্তিয়ার ইতিহাসে কোন তথ্য নেই। খুব সম্ভবত এটি কোন বিখ্যাত দরবেশ বা দরবেশদের মোকাম। যে রাজা এই মোকামটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁরও পরিচয় মেলেনি। শুধু এটুকুই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মোকামটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৬৫ সালের আগে অর্থাৎ হযরত কাশিম শাহের জৈন্তিয়ায় আগমনের পূর্বে।



চিত্র: মোকামবাড়ির প্রাচীন মোকাম

যেহেতু হযরত কাশিম শাহ একজন দরবেশ ছিলেন তাই রাজা বড়গোসাঁই তাঁকে দরবেশদের মোকামের পাশেই বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়িটি ছিল একই সাথে বসতবাড়ি, খানকাহ, যিকির-আযকার এবং ধর্মীয় শিক্ষালাভের কেন্দ্র। হযরত কাশিম শাহ জৈন্তিয়ায় এসেই বুঝতে পেরেছিলেন এখানকার মুসলমানদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ভুল রীতি-নীতি দূর করতে হলে সঠিক ধর্মশিক্ষা প্রচারের বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাড়িটিকেই ইসলামী তরবিয়তের কেন্দ্রে পরিণত করলেন। বাড়িটিতে রাতদিন তা'লিম-তরবিয়ত এবং যিকির-আযকার চলতো। সাধারণ মুসলমানরা এখানে এসে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতো। অল্পদিনের মধ্যেই বাড়িটি জৈন্তিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। জৈন্তিয়াব্যাপী বিশুদ্ধ ইসলামী ধর্মমত ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে এই বাড়িটি এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল। হযরত কাশিম শাহের বংশধররা আজও এখানে বসবাস করছেন। রাজার আমলের স্মৃতি নিয়ে এই বাড়ির ফটকটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। তবে রাজা বড়গোসাঁই এখানে যে ঘরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন সেটির কোন চিহ্ন এখন আর নেই। ১৮৯৭ সালের ভুমিকম্পে এটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর ১৯১১ সালে আগুন লেগে এটি পুরোপুরিভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

রাজা বড়গোসাঁইয়ের ভাগিনেয় ফতেহ খাঁ ছিলেন জৈন্তিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ বিষয়দার ও সেনাপতি। তিনি হযরত কাশিম শাহকে নিজের পির বা মুরশিদ হিসেবে মান্য করতেন। মুরশিদের বাড়ির পাশে তিনি একটি ছোটখাটো মসজিদ বানিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্যের সকল ক্ষমতা ফতেহ খাঁ-র হাতে চলে যাওয়ায় আনুমানিক ১৭৬৭ সালে আমাত্যদের একটি বড় অংশ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই কুচক্রীরা রাজার সাথে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। জনশ্রুতি আছে যে, কুচক্রীরা তাঁর হাতে নির্মিত মসজিদটিও ভেঙ্গে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় হযরত কাশিম শাহ মোকামবাড়িতেই একটি অস্থায়ী মসজিদ চালু করেন। প্রায় দুই বছর ধরে জয়ন্তীপুরের মুসলমানরা এই অস্থায়ী মসজিদেই নামাজ আদায় করেছিলেন। ওই সময়ে বন্দরহাটিতে একটি বিশাল রাজকীয় মসজিদের নির্মাণকাজ চলছিল। রাজা বড়গোসাঁই ফতেহ খাঁ-কে হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন্দরহাটিতে ওই রাজকীয় মসজিদটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন।



চিত্র: মোকামবাড়ির রাজকীয় ফটক

১৭৬৯ সালে রাজকীয় মসজিদটি নির্মিত ও চালু হয়ে গেলে হযরত কাশিম শাহ এর ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি মোকামবাড়ির অস্থায়ী মসজিদটি বন্ধ করে দেন এবং সেখানে একটি কিতাবের দরসখানা চালু করেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা মূলত এই দরসখানা থেকেই। হযরত কাশিম শাহ এই দরসখানায় তাঁর ছাত্রদেরকে ইসলামের ধর্মের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। জৈন্তিয়া রাজ্যে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা প্রতিষ্ঠায় এই দরসখানার প্রভাব ছিল ব্যাপক (হযরত কর্তৃক খানকাহ ও দরসখানা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দুই শতক ধরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা অর্জনে জৈন্তিয়ার মুসলমানদের আগ্রসরতা চোখে পড়ার মতো)। হযরতের বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোকামবাড়িতে নির্মিত এই দরসখানাটি বহুবার সংস্কারের মধ্য দিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত টিকেছিল। এটিকে সর্বশেষ সংস্কার করা হয়েছিল ১৯২৪ সালে। ওই বছর হযরতের বংশের বিশিষ্ট সন্তান জনাব সিকান্দার আলী খন্দকার মোকামবাড়িতে একটি নতুন বসতঘর

নির্মাণের সময় পুরানো দরসখানাটিকে সংস্কার করে নিজের বৈঠকখানায় পরিণত করেছিলেন।



চিত্র: ১৯২৪ সালে নির্মিত মোকামবাড়ির বসতঘর

তখন থেকে অগণিত সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকগণ এ বৈঠকখানার মেহমান হয়েছিলেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সাদউল্লাহ (১৯৩৭ অথবা ৩৮ সালে), সিলেটের ডিসি খোরশেদ আলম, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, রুকুনুজ্জামান খান দাদাভাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ ঘরের অতিথি হয়েছিলেন। সৈয়দ মূর্তাজা আলী তাঁর 'হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া' বইটি রচনার কাজে জৈন্তিয়ায় আসার পর একাধারে ১৫ দিন এই ঘরেই থেকেছিলেন। খন্দকার সাহেবের কাছ থেকে তখন তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাস বিষয়ক প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন। খন্দকার সাহেব ছিলেন বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের অধিকার আদায়ের প্রাণপুরুষ। তাঁর কর্মতৎপরতার কারণে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মোকামবাড়ি ছিল বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের অঘোষিত সদরদপ্তর। ওই সময়ে জৈন্তিয়া ১৭ পরগনার বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে মোকামবাড়ির

বৈঠকখানাতেই। ১৯৫৬ সালে খন্দকার সাহেবের মৃত্যুর পর থেকে এটি পড়ার ঘর এবং লাইব্রেরি ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সর্বশেষ এটি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২০০২ সাল থেকে ঘরটি আর কোন কাজে ব্যবহৃত হয়নি। পরিত্যক্ত ও অতিজীর্ণ হওয়ার কারণে ২০২২ সালে ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। তবে খন্দকার সাহেবের বানানো বসতঘরটি আজও মোকামবাড়িতে টিকে আছে এবং তাঁর বংশধররা সেখানেই বসবাস করছেন।



চিত্র: হযরত কাশিম শাহের মোকাম

হযরত কাশিম শাহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৭৭১ সালে। মৃত্যুর পর তাকে মোকামবাড়ির পশ্চিম পাশে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিস্থলে একটি অনুচ্চ দেয়াল রয়েছে। এই দেয়ালবেষ্টিত সমাধি বা মোকামটি হযরত কাশিম শাহের একার নয়। এর ভেতরে মোট তিন জনের কবর রয়েছে। কাশিম শাহের পুত্র ময়না শাহ এবং ময়না শাহের পুত্র কাদির বখসের কবরও এখানে রয়েছে। কাদির বখস মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৮৯৭ সালে। খুব সম্ভবত, কাশিম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর কবরের দুই পাশে পর্যাপ্ত জায়গা রেখে দেয়ালটি তোলা হয়েছিল। পরে এই দেয়ালের ভেতরে, তাঁর দুপাশে বাকি দুজনকে সমাহিত

করা হয়েছিল। মোকামটি বর্তমানে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের ঠিক পাশেই অবস্থিত। ১৯১৮ সালের ল্যান্ড সার্ভের নকশাতে এটিকে আলাদা দাগ দ্বারা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছিল। এর পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে সিলেট-শিলং হাইওয়ে চালু করার সময় মোকামটিকে রাস্তার বাইরে রাখা হয়েছিল। পাক আমলে এবং বর্তমান বাংলাদেশের নতুন সার্ভেতেও এই মোকামটিকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। বর্তমানের জৈন্তাপুর উপজেলা সদরের বাসস্ট্যান্ড থেকে সামান্য দক্ষিণে, মহাসড়কের পূর্ব পাশে মোকামটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

অধ্যায় পনেরো
লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দির

১৭৭০ সালে জৈন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। এর পূর্বে তিনি রাজবাড়ির পশ্চিমদিকের (১৫-২০ ফুট নিচুতে) খোলা জায়গায় একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের যেসব স্থাপনা আজও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে তার মধ্যে এই মন্দিরটি অন্যতম। জৈন্তিয়া রাজ্যের টিকে থাকা স্থাপনাগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে উঁচু। জৈন্তিয়া রাজবাড়ির পশ্চিমপাশে অবস্থিত বর্তমান খেলার মাঠ বা স্টেডিয়ামের ঠিক দক্ষিণ পাশে এর অবস্থান। এটি একটি কালীমন্দির। ১৭৬৯-৭০ সালে এটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরে রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ধর্মগুরু লীলাপুরী স্বামীর হাতে এর সেবায়েতের দায়িত্ব তোলে দিয়েছিলেন। মন্দিরের ব্যবস্থাপনাসহ সেবায়েতের ভরণ-পোষণের জন্য রাজা বেশ কিছু ভূমিও দান করেছিলেন। একটি তাম্রফলক বা তাম্রপত্রে এই ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই দলিলে রাজা বড়গোসাঁইয়ের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের কথা এবং তাঁর গুরু লীলাপুরী স্বামীর হাতে একটি মন্দিরের দায়িত্ব ও ১৯২ কেদার ভূমির ভোগ-দখলের অধিকার তোলে দেওয়ার কথা বেশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রফলকের এই দলিলটি ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছিল।

দলিলটির ভাষ্য অনুযায়ী, ১৬৯২ শকাব্দে (১৭৭০ সালে) রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ধর্মগুরু শ্রী শ্রী লীলাপুরী স্বামীর মুখ থেকে পরমহংস মন্ত্র গ্রহণ করে সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করেন এবং 'শ্রী শ্রীমদ রাজপুরী' নামধারণ করেন। একই সাথে রাজা লীলাপুরীর হাতে একটি মন্দিরের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ওই মন্দিরের উপাসনাসহ অন্যান্য ধর্মীয় কাজের নিমিত্তে লীলাপুরীকে ১৯২ কেদার ভূমি প্রদান করেন। ১৯২৩ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* এই দলিলের পাঠোদ্ধারসহ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত দলিলটির ইংরেজি অনুবাদের কিছু অংশ হল:
After having given a temple, he has made over one hundred and ninety-two Kedaras of land with all rights abandoned to his preceptor's feet for the maintenance of that (temple) as

well as for pleasing his spiritual preceptor, Sri Sri Lilapuri. এই অংশটুকু হচ্ছে তাম্রফলকের দলিলটির ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম লাইনের ইংরেজি অনুবাদ।



চিত্র: লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দির

কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনাতেও লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দিরটির কথা উঠে এসেছে। শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, "কথিত আছে, বড় গোসাঞির সময়ে নিজপাটের প্রসিদ্ধ কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হন। প্রাচীর বেষ্টিত বাটীকায় সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কালীর এরূপ মাহাত্ম্য ছিল যে, কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কালী বাড়ীতে আশ্রয় লইতে পারিলে দণ্ড হইতে মুক্ত হইত। এই কালীর

অর্চ্চনার জন্য লীলাপুরী নামক এক সন্ন্যাসী যুবককে নিযুক্ত করা হয়।" মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তাঁর *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে রাজা বড়গোসাঁই সম্পর্কে লিখেছেন, "ইহার পর নিজপাটের প্রসিদ্ধ কালীমুর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত ও সুন্দর বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং কালীর সেবা অর্চ্চনার জন্য লীলাপুরী নামক সন্ন্যাসীকে নিযুক্ত করেন।"

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় কালীমন্দিরটির চারপাশে একটি প্রাচীর ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্যের সত্যতা আজও মিলে। কালীমন্দিরের প্রাচীরের একাংশ আজও টিকে আছে। এমনকি প্রাচীরের গায়ের ফটকটিও টিকে আছে। একসময় এই মন্দিরের গায়ের একটি প্রস্তরফলকে 'কালীমন্দির' শব্দটি লিখা ছিল। বর্তমানে এই প্রস্তরফলকটি আর নেই। মন্দিরটির গায়ে কিংবা এর প্রাচীরের ফটকে কোন নামফলক না থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে এটি একটি নামবিহীন মন্দিরে পরিণত হয়েছে। কোন রাজা এটি বানিয়েছিলেন তা-ও এখন আর কেউ বলতে পারে না। তাই মন্দিরটিকে চিহ্নিত করতে গেলে পুরোপুরিভাবে যুক্তির উপরে নির্ভর করতে হয়। কিছু শক্তিশালী যুক্তির ভিত্তিতে এই মন্দিরটির পরিচয় নিশ্চিত করা যায়।

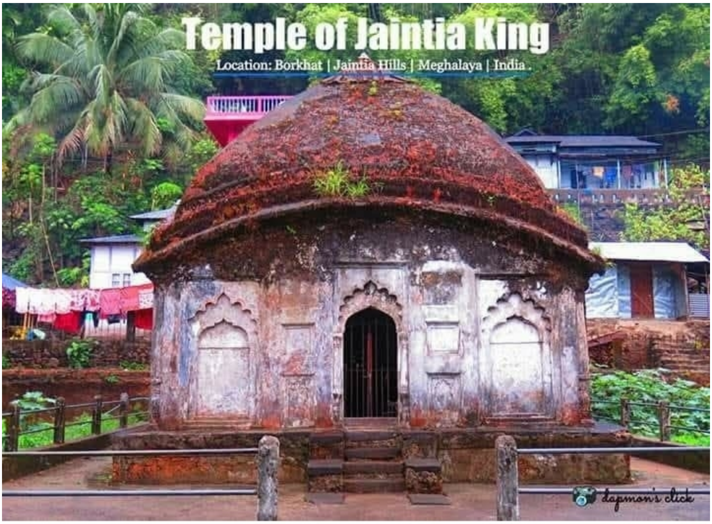
ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী 'প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির' খুঁজতে গেলে এই মন্দিরটিকেই পাওয়া যায়। জৈন্তিয়ার রাজবাড়ির প্রাচীরের ভেতরে একটি মন্দির রয়েছে। কিন্তু সেটি 'সুন্দর ও বৃহৎ' নয় এবং সেটি একটি পারিবারিক (রাজপরিবারের) মন্দির ছিল। জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রাচীরের ভেতরেও কোন বৃহৎ মন্দির কিংবা বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নেই। এই বাড়িটি ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রশাসনিক সদরদপ্তর। এখানে এমন একটি মন্দির নির্মাণের কোন সম্ভাবনা নেই যে মন্দিরের সীমানা প্রাচীরের অন্তর্ভুক্ত ভূমিটুকু একজন সেবায়েতের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি (দেবোত্তর) হবে। রাজবাড়ির ক্ষেত্রেও একথাটি খাটে। জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্যান্য যতো মঠ-মন্দির কিংবা মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেগুলোর কোনটি কীভাবে নির্মিত হয়েছিল তা বেশ স্পষ্ট। সেসবের মধ্যে রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক নির্মিত কালীমন্দিরের সন্ধান করার কোন সুযোগ নেই। এই মন্দিরটির সন্ধান রয়েছে এমন একটি মন্দিরের মধ্যে যা একটি 'প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির' এবং যা অন্য কোন মঠ-মন্দিরের নামে পরিচিত নয়। এমন মন্দির নিজপাটে একটিই রয়েছে। তাই এটিই সেই মন্দির।

অধ্যায় ষোল
বড়ঘাটের মঠ সিয়েম

১৭৭০ সালে রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যান। তিনি লীলাপুরী স্বামীর কাছ থেকে পরমহংস মন্ত্র গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় রাজপুরী সন্ন্যাসী। নীরবে-নিভৃতে বাকি জীবন কাটানোর জন্য তিনি পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ের লখডং পুঞ্জির একটি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে এই গ্রামটি 'বড়ঘাট' নামে পরিচিত। গ্রামটির অবস্থান থিসাং নদীর (Wah Thisang) তীরে। রাজা বড়গোসাঁইয়ের নামের 'বড়' শব্দটি এবং নদীর ঘাটের 'ঘাট' শব্দ মিলিয়ে গ্রামটি বড়ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তৎকালীন নদী-যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই গ্রামের একটি 'ঘাট' ব্যবহৃত হতো বলেই অনুমেয়। বর্তমানে এই গ্রামে সড়কপথে যাওয়া যায়। শিলং থেকে Amlarem হয়ে এই গ্রামের দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার। জোয়াই থেকে Lad Rymbai হয়ে এই গ্রামের দূরত্ব ৭১ কিলোমিটার। আর পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ের খিলিয়েহরিয়াট থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার।

রাজা বড়গোসাঁই যখন এই গ্রামে পাড়ি দিয়েছিলেন তখন এখানে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর পারাং (Parang) ক্ল্যানের লোকজন বসবাস করতো। বর্তমানে এখানে সিন্টেংদের রিম্বাই, সাচেন, লিংদহ ও সিউয়ার (Rymbai, Suchen, Lyngdoh, Swer) ক্ল্যানের লোকজনের বসবাস রয়েছে। তাদের প্রায় সকলেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী (অতীতে তারা নিয়েমট্যানরাই ধর্মের অনুসারী ছিলেন)। তবে রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সনাতনী মন্দিরটি নিয়ে তারা বেশ গর্ববোধ করেন। স্থানীয়ভাবে এই মন্দিরটি 'সিয়েমের মঠ' (Mot Syiem) নামে পরিচিত। জৈন্তিয়ার রাজাদেরকে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর লোকজন 'সিয়েম' বা 'সিয়েম সুতংগা' বলে ডাকতো। তাই বড়ঘাটে রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থাপনাগুলোর নামের সাথে এই শব্দটি যুক্ত রয়েছে। সিয়েমের মঠ ছাড়াও রাজার হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বাজারটিকে স্থানীয়রা 'সিয়েমের ইয়েও' (Iew Syiem) নামে ডাকেন। এছাড়াও কয়েকটি প্রাচীন পাথরকে তারা 'সিয়েমের দিয়েংদু' (Diengduh Syiem) নামে ডাকেন।

বড়ঘাটে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্মৃতি বিজড়িত মঠ-মন্দির, বাজার এবং প্রাচীন পাথর ছাড়াও তাঁর বাসস্থানের সামান্য অংশও টিকে আছে। এর অবস্থান থিসাং নদীর ঠিক পাশেই। জনশ্রুতি আছে যে, সুদূর অতীতের এক দানবীয় পাহাড়ি ঢলের তোড়ে এই বাসস্থানের উপরের অংশ নদীতে হারিয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে রাজার বাসস্থানের শুধু ভিত্তিটিই টিকে আছে। ‘সিয়েমের দিয়েংদু’ নামে পরিচিত পাথরগুলো নিয়েও স্থানীয়ভাবে কিছু অতিরঞ্জিত গল্প প্রচলিত আছে। এসব গল্প থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে ‘উ মার ফালিংকি’ নামের এক দানব এসব পাথর বহন করে বড়ঘাটে নিয়ে এসেছিল (জৈন্তিয়ার অন্যান্য স্থানের পাথরের সাথেও একই দানবের গল্প জড়িয়ে আছে)। রাজা বড়গোসাঁইয়ের মঠ বা মন্দিরটি নিয়েও স্থানীয়দের মতে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া গ্রন্থের* লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী বড়ঘাটের স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জেনেছিলেন যে, একসময় এই মন্দিরে পাঠা বলি দেওয়ার প্রচলন ছিল।



চিত্র: বড়ঘাটের মঠ সিয়েম

রাজা বড়গোসাঁই বড়ঘাটে কতদিন বসবাস করেছিলেন তা জানার কোন উপায় নেই। তাঁর মৃত্যুর কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তবে

বড়ঘাটের স্থাপনাগুলো দেখে মনে হয়, রাজা বেশ কিছুদিন সেখানে বসবাস করেছিলেন। বড়ঘাটের অধিবাসীরা সনাতন ধর্মাবলম্বী না হলেও তাদের জনগোষ্ঠীর সিয়েম হিসেবে তারা রাজাকে বেশ সম্মানের চোখেই দেখতেন। এখনও রাজার প্রতি তাদের এই সম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার মঠটিকে তারা একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত করেছেন। মঠের চারপাশে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রেখেই আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে। মঠটিও নিয়মিত সংস্কারের ফলে বেশ অক্ষত অবস্থায়ই রয়েছে। জৈন্তিয়া রাজ্যের যতগুলো স্থাপনা এখনও টিকে আছে তার মধ্যে শুধু এই স্থাপনাটিই নির্মাণকালের কারুকাজ ধরে রাখতে পেরেছে। মঠের প্রবেশদ্বার, দেয়াল, ছাদ ও ভেতরের পাঠা বলির বেদির গায়ের বিভিন্ন কারুকাজ এখনও পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প এই স্থাপনাটির কোন ক্ষতি করেনি বলেই মনে হয়।

অধ্যায় সতেরো

হযরত শাহজির মোকাম

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলি মোকাম বা সমাধিস্থল আজও মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। এসব মোকাম জৈন্তিয়া রাজ্যের পির-দরবেশদের প্রতি রাজাদের শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সাথে এগুলি জৈন্তিয়া রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এসব মোকামের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও রাজকীয় মোকাম হচ্ছে হযরত শাহজি (রহ.)-র মোকাম। এই শাহজি কে ছিলেন তা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে মনে করেন, তিনি ছিলেন হযরত শাহজালাল (রাহ.)-র সফরসঙ্গীদের কেউ। এই ধারণাটি ভুল। এর কারণ, হযরত শাহজালাল সিলেটে এসেছিলেন চতুর্দশ শতকে। আর শাহজির মোকাম নির্মিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা বিজয়নারায়ণ সিংহ বা বিজয় সিংহ।



চিত্র: হযরত শাহজির মোকাম

জনশ্রুতি আছে যে, এই রাজা সকল ধর্মের গুরুদেরকেই বেশ সম্মান করতেন। তাঁর আমলে বন্দরহাটি মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন হযরত শাহজি । তিনি ছিলেন জৈন্তিয়ার বিখ্যাত দরবেশ হযরত কাশিম শাহের ছাত্র ও শিষ্য। কাশিম শাহের পরে তিনিই জৈন্তিয়ার সবচেয়ে বড় দরবেশ ছিলেন। রাজা বিজয়নারায়ণ এই মুসলমান ধর্মগুরুকে বেশ সম্মান করতেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর রাজা তাঁর সমাধিস্থলে একটি দৃষ্টিনন্দন মোকাম বা সমাধিঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে নির্মিত যেসব স্থাপনা আজও পুরোপুরিভাবে অক্ষত আছে তার মধ্যে এই সমাধিঘরটি অন্যতম। জৈন্তিয়ার অন্যান্য মোকামের মতো এটিতেও মূল ব্যক্তির সাথে আরও কয়েকজন সমাহিত রয়েছেন; সমাধিঘরটির ভেতরে রয়েছে তিনজনের সমাধি আর বাইরে রয়েছে দুজনের সমাধি।



চিত্র: হযরত শাহজির মোকামের ভেতরের দৃশ্য

হযরত শাহজির সমাধিটি ঘরের ভেতরে। সেখানে তাঁর দুজন খাদেমও সমাহিত রয়েছেন। ঘরের মেঝেতে নির্মিত তিনটি সমাধি দেখতে হুবহু একই রকম। এগুলোর নির্মাণশৈলীতে কোন পার্থক্য নেই। দেখে মনে হয় যে, হযরত শাহজির দুই খাদেমও তাঁর মতোই মর্যাদাবান ছিলেন। তাই রাজা বিজয়নারায়ণ একই আকৃতিতেই সমাধিগুলোকে বাঁধাই করেছিলেন এবং একটি রাজকীয় সমাধিঘরের ভেতরে এগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত শাহজির সাথের দুই খাদেমের মৃত্যুর সময়কাল অজ্ঞাত। হতে পারে যে, তারা হযরত শাহজির আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, তারা শাহজির পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাদের মৃত্যুর পরেই মোকামটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল।

রাজা বিজয়নারায়ণের শাসনকাল ছিল ১৭৮৫ সাল থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত। এরই মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে তিনি হযরত শাহজির মোকাম বা সমাধিঘরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন যুগের বিচারে অত্যন্ত নান্দনিক শৈলীতে এটি নির্মিত হয়েছিল। ঘরটির দক্ষিণের দেয়ালের কারুকাজ চোখে পড়ার মতো। এই দেয়ালের মাঝখানে রয়েছে ঘরটির প্রবেশদ্বার। পশ্চিমের দেয়ালেও কিছু কারুকাজ রয়েছে। পূর্বের দেয়ালজুড়ে রয়েছে অত্যন্ত চমৎকার একটি ঘুলঘুলি বা ভেন্টিলেটর। দিনের বেলায় এই ঘুলঘুলি দিয়েই ঘরের ভেতরে আলো প্রবেশ করে। রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য একসময় ঘরের ভেতরে প্রদীপ জ্বালানোর প্রচলন ছিল। ঘরের ভেতরের দেয়ালের গায়ে প্রদীপ রাখার কুটুরিগুলো আজও পুরোপুরিভাবে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

রাজা বিজয় সিংহের শাসনামল কিংবা তাঁর পরবর্তী কোন রাজার শাসনামলে হযরত শাহজির সমাধিঘরটির বাইরে আরও দুজনকে সমাহিত করা হয়েছিল। এদের সমাধিগুলোও রাজকীয় শৈলীতে বাঁধানো রয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত শাহজির কন্যা। অপর ব্যক্তিটি কে ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে তিনি যে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন কেউ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাইরের দুটো সমাধির নির্মাণশৈলীর সাথে ঘরের ভেতরের সমাধিগুলোর নির্মাণশৈলীর বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঘরের ভেতরের তিনটি সমাধি আর বাইরের দুটো সমাধি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। একটি অনুচ্চ দেওয়াল দিয়ে বাইরের দুটো সমাধিকে মূল

সমাধিঘরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এই দেওয়ালটি অবশ্য আগের আমলের দেওয়াল নয়; এটি বর্তমান আমলের।

হযরত শাহজির মোকামটির অবস্থান সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের একেবারে কাছেই। সিলেট শহর থেকে বেশ সহজেই সেখানে যাওয়া যায়। মোকামটি দেখতে হলে সিলেট শহর থেকে জৈন্তাপুর উপজেলা সদরগামী কোন গাড়িতে উঠতে হবে। গাড়ি থেকে নামতে হবে জৈন্তাপুর উপজেলা সদর বা বাসস্ট্যান্ডের সামান্য আগে (প্রায় দেড় কিলোমিটার আগে) ফেরীঘাট সেতুর দক্ষিণে। এই জায়গাটির নাম ফেরীঘাট ববরবন্দ। ফেরীঘাট সেতুর সামান্য আগে ববরবন্দ এলাকায় সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের পশ্চিমপাশে একটি মসজিদ দেখা যায়। এই মসজিদটির নাম ভিত্রিখেল জামে মসজিদ। হযরত শাহজির মোকামটির অবস্থান এই মসজিদের পাশেই (সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক থেকে মোকামটিকে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়)।



চিত্র: হযরত শাহজির মোকামের পূর্ব দেয়ালের ঘুলঘুলি

অধ্যায় আঠারো
সোনাধনের বাড়ি

জৈন্তিয়ার রাজধানী জয়ন্তীপুরের (বর্তমান নিজপাট) বাইরে যেসকল রাজকীয় স্থাপনা আজও মানুষের দৃষ্টি কাড়ে তার মধ্যে কানাইঘাট উপজেলার বড়চতুল গ্রামে অবস্থিত সোনাধনের বাড়িটি অন্যতম। বড়চতুল হাই স্কুলের সামান্য উত্তরে অবস্থিতি এই রাজবাড়িটি এখন পর্যটকদের কাছে বেশ আকষর্ণীয় হয়ে উঠেছে। আনুমানিক ১৭৮৮-৮৯ সালে এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন জৈন্তিয়ার তৎকালীন রাজা লক্ষ্মী সিংহ। জীবন রক্ষার প্রতিদানস্বরূপ তিনি চতুলের খাদন লস্করের পরিবারকে এই বাড়িটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৭৮৮ সালে লক্ষ্মী সিংহের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে খাদন লস্কর নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্র সোনাধন লস্কর তখন খুবই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। রাজা লক্ষ্মীসিংহ এই পরিবারটিকে অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি সোনাধন লস্করকে নিজের পালকপুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সোনাধন ও তাঁর মায়ের জন্য পুরোপুরি রাজবাড়ির আদলে একটি বাড়ি বানিয়ে দেন। অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এই বাড়িটি জৈন্তিয়া রাজ্যের অধিবাসীদের কাছে 'সোনাধনের বাড়ি' নামে খ্যাতি পেয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বাড়িটির সামনের অংশ এবং একটি মন্দিরসদৃশ স্থাপনা আজও বেশ অক্ষত অবস্থায় আছে। এই বাড়িটি জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্বাক্ষী।

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা বিজয়নারায়ণের শাসনামলে (১৭৮৫- ১৭৮৮ সাল) জৈন্তিয়া পাহাড়ের নারতিয়াং পুঞ্জির সরদার বা দলইয়ের পুত্র লক্ষ্মী সিংহ রাজপরিবারের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেছিলেন। তাঁর পিতা উপাংদলই ছিলেন জৈন্তিয়া পাহাড়ের একজন প্রভাবশালী সরদার। লক্ষ্মী যখন বয়সে শিশু ছিলেন তখন তাঁর পিতার সাথে একবার জৈন্তিয়ার রাজধানীতে এসেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে কিছুদিন রাজবাড়িতে থেকেছিলেন। রাজবাড়ির লোকজন তাকে খুবই স্নেহ করতেন। পরিণত বয়সেও তিনি তাদের পছন্দের পাত্র ছিলেন। একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান যুবক হওয়ায় রাজা বিজয়নারায়ণ তাকে রাজসভার সদস্য বানিয়েছিলেন। লক্ষ্মী তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে রাজসভায় উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করে দিতেন। নিজ

দক্ষতার কারণে তিনি ক্রমশ রাজসভার সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন এবং একই সাথে তিনি রাজার সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তিতেও পরিণত হন। একসময় দেখা গেলো, রাজসভায় রাজা শুধু লক্ষ্মীর কথাই শুনছেন; অন্য কারও কথা শুনছেন না। এতে অন্যদের মনে হিংসা জন্ম নিল। লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে তারা চক্রান্তে নামল।



চিত্র: সোনাধনের বাড়ির খিলানবিশিষ্ট অংশ

এই চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে রাজা লক্ষ্মীকে হত্যার আদেশ দিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী রাজধানী থেকে পালিয়ে নিজ পুঞ্জিতে চলে গেলেন। লক্ষ্মীর এই পলায়নে সহায়তার দায়ে রাজা চতুলের খাদনলস্করকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এতে পাহাড়িরা রাজার উপর অসন্তুষ্ট হয়। তারা সমতলের সাথে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। পাহাড়ি পণ্যের অভাবে সমতলে নানান সমস্যা দেখা দেয়। তিন বছর পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চালু থাকার পর সমতল ও পাহাড়ের সরদাররা মিলে সিদ্ধান্ত নেন, রাজাকে হত্যা করে লক্ষ্মী সিংহকেই রাজা বানানো হবে। তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী রাজা বিজয়নারায়ণকে জয়ন্তীপুরের নিকটস্থ কেন্দ্রিবিলের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় এবং সেখানকার একটি টিলার উপরে তাকে সমাহিত করা হয়। এরপর লক্ষ্মী সিংহ রাজা হন। তিনি চতুলের খাদনলস্করের পুত্র সোনাধনকে একটি রাজকীয় বাড়ি বানিয়ে দেন। সোনাধনকে তিনি নিজের পুত্রসন্তানের মতো স্নেহ করতেন। একবার এক প্রভাবশালী দলইয়ের কন্যা সোনাধনকে প্রচণ্ড অপমান করলে রাজা সেই কন্যার সঙ্গেই সোনাধনের বিয়ের

ব্যবস্থা করেন (মতান্তরে দলইকন্যা স্বেচ্ছায় সোনাধনের স্ত্রী হয়েছিলেন)। এতে দলই প্রবল ক্ষিপ্ত হন। অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি একদিন কৌশলে এক পাটনীকে দিয়ে সোনাধনকে হত্যা করান। সোনাধনের স্ত্রী স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে নিজ পিতাকেই হত্যা করেন। এরপর সবকিছু শান্ত হয়ে আসে।



চিত্র: সোনাধনের বাড়ির খিলানবিশিষ্ট অংশের অভ্যন্তরভাগ

জৈন্তিয়া অঞ্চলের লেখক-গবেষকরা সোনাধন লস্করের পরিবার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য উদ্ধার করেছেন। জৈন্তিয়ার ইতিহাস গবেষক মো. ফয়জুল হকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সোনাধনের মাতা খুব বেশিদিন বিধবা অবস্থায় ছিলেন না। খাদন লস্করের মৃত্যুর পর তিনি লীলা চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। এই লীলা চৌধুরীর প্রকৃত নাম ছিল লীলা ঠাকুর সেনগুপ্ত। তাঁর বাড়ি ছিল মোগলানের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার আমুড়ায়। সেখান থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে জৈন্তিয়ায় এসে তিনি চতুল এলাকায় অবস্থান করছিলেন। বড়চতুল গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথে তিনি একদিন খাদন লস্করের বিধবা স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তিনি এই সুন্দরী নারীকে বিয়ে

করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর জন্য মোটেও সহজ ছিল না। এর কারণ, খাদন লস্করের স্ত্রী ছিলেন মুসলমান আর লীলা ঠাকুর ছিলেন হিন্দু। মুসলমান নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় একটি একটি বাঁধা হয়ে উঠেছিল।



চিত্রঃ সোনাধনের বাড়ির মন্দিরসদৃশ স্থাপনা

এখানেই শেষ নয়, লীলা ঠাকুর ছিলেন বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। হিন্দু সমাজে নিজের স্ত্রী-সন্তান থাকা অবস্থায় অপর নারীকে বিয়ের বিষয়টিকে খুবই আপত্তিকর মনে করা হতো। এসব সীমাবদ্ধতা থেকে বাঁচার জন্য লীলা ঠাকুর ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর নতুন নাম হল লীলা চৌধুরী। এরপর তিনি খাদন লস্করের স্ত্রী অর্থাৎ সোনাধনের মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু তাঁর আগের স্ত্রী ধর্মান্তরিত হলেন না। দুই সন্তানসহ তিনি হিন্দু থেকে গেলেন। দ্বিতীয় বিবাহের পর লীলা চৌধুরী উভয় স্ত্রীকে নিয়ে চতুলেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর এক সন্তানের নাম ছিল বিষ্ণুরাম (অপর সন্তানের নাম জানা যায় না)। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তিনি দুটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। দুই পুত্রসন্তানের নাম ছিল লাল ও দুলাল। তাদের বোনের নাম অজানা। এই বোনের বিয়ে হয়েছিল দক্ষিণ জৈন্তিয়ার বর্ণফৌদ পরগনার তালবাড়ি গ্রামে।



চিত্র: সোনাধনের বাড়ির একটি খিলানের ভেতরের চিত্র

বিষ্ণুরাম, লাল ও দুলালের বংশধররা যুগ যুগ ধরে বড়চতুল গ্রামে বসবাস করেছেন। বড়চতুল গ্রামের খায়রুল হক চৌধুরী ওরফে মাখই চৌধুরী ছিলেন লাল অথবা দুলালের বংশধর। লাল ও দুলালের সৎভাই সোনাধনের কোন বংশধরের তথ্য মিলে না। বিয়ের অল্পদিন পরেই তিনি শশুরের চক্রান্তে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর কোন সন্তানের জন্ম হয়নি বলেই মনে হয়। রাজা লক্ষ্মীসিংহ তাঁর জন্য যে রাজকীয় বাড়িটি বানিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে তাঁর সৎ ভাই-বোনরাই বসবাস করতেন। এই বাড়ির সামনের একটি অষ্টভূজাকৃতির স্থাপনা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি সোনাধনের সমাধি। কিন্তু এর আকৃতি বলে ভিন্ন কথা। এটি একটি চমৎকার চূড়াবিশিষ্ট স্থাপনা এবং এর একাধিক প্রবেশদ্বারও রয়েছে। একটি সমাধির একাধিক প্রবেশদ্বার থাকার কথা নয়।



চিত্রঃ সোনাধনের বাড়ি ও মন্দিরসদৃশ স্থাপনা

স্থানীয়দের মতে এটি একটি মন্দির। এই মতটিকে গ্রহণ করতে গেলে প্রশ্ন উঠে, রাজা লক্ষ্মীসিংহ এটি বানিয়ে দিলেন কার জন্য? সোনাধন এবং তাঁর মা ছিলেন মুসলমান। তাদের জন্য মন্দির নির্মাণের কোন কারণ নেই। এই গোলমালের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, রাজা লক্ষ্মীসিংহ যখন

সোনাধনের বাড়িটি বানিয়ে দিচ্ছিলেন তখন লীলা চৌধুরী সোনাধনের মাকে বিবাহ করে এখানেই চলে এসেছিলেন এবং নিজের হিন্দু স্ত্রী-সন্তানদেরকেও এখানে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা লক্ষ্মীসিংহ হয়তো লীলা চৌধুরীর হিন্দু স্ত্রী-সন্তানদের জন্যই বাড়ির সামনে এই মন্দিরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃত সত্য যাচাই কোন উপায় এখন আর কারও হাতে নেই। কালের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এই মন্দিরসদৃশ স্থাপনাটি আজও বড়চতুল গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। মূল বাড়ির খিলানবিশিষ্ট সামনের অংশটিও টিকে আছে। তবে পেছনের অংশটি পুরোপুরিভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

অধ্যায় উনিশ
রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধি

জৈন্তাপুর উপজেলার শাপলা বিলের একটি স্থাপনা বাংলাদেশের পর্যটকদের কাছে বেশ পরচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরেখা সংলগ্ন ডিবির হাওর ও কেন্দ্রিবিলের মধ্যবর্তী টিলার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা এই স্থাপনাটি একজন হতভাগ্য রাজার সমাধি। এই রাজার নাম ছিল বিজয়নারায়ণ সিংহ। ১৭৮৫ সালে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। ১৭৮৮ সালে রাজ্যের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি কেন্দ্রিবিলের পানিতে নৌকাডুবির শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এর দুই বছর পর জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন তাঁর ভাগিনেয় দ্বিতীয় রামসিংহ। তিনি সিংহাসনে আরোহনের পরপরই প্রয়াত রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধি নির্মাণের উদ্যোগ নেন। আনুমানিক ১৭৯০-৯১ সালে তিনি বিজয়নারায়ণের সমাধিস্থলে একটি দৃষ্টিনন্দন সৌধ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। সৌধটি এতোটাই মজবুত করে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পেও তা ভেঙ্গে পড়েনি। বর্তমানেও এটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কেন্দ্রিবিল, ডিবির হাওর ও অন্য দুটি বিল বর্তমানে 'শাপলা বিল' নামে একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যেসব পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধিসৌধটিও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু এর ইতিহাস জানা না থাকায় তারা এটিকে একটি মন্দির বলেই ধারণা করেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা বিজয়নারায়ণের শাসনামলে (১৭৮৫- ১৭৮৮ সাল) জৈন্তিয়া পাহাড়ের নারতিয়াং পুঞ্জির সরদার বা দলইয়ের পুত্র লক্ষ্মী সিংহ রাজপরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতা উপাংদলই ছিলেন জৈন্তিয়া পাহাড়ের একজন প্রভাবশালী সরদার। লক্ষ্মী যখন বয়সে শিশু ছিলেন তখন তাঁর পিতার সাথে একবার জৈন্তিয়ার রাজধানীতে এসেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে কিছুদিন রাজবাড়িতে থেকেছিলেন। রাজবাড়ির লোকজন তাকে খুবই স্নেহ করতেন। পরিণত বয়সেও তিনি তাদের পছন্দের পাত্র ছিলেন। একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান যুবক হওয়ায় রাজা বিজয়নারায়ণ তাকে রাজসভার সদস্য বানিয়েছিলেন। লক্ষ্মী তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে রাজসভায় উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করে দিতেন। নিজ দক্ষতার কারণে

তিনি ক্রমশ রাজসভার সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন এবং একই সাথে তিনি রাজার সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তিতেও পরিণত হন। একসময় দেখা গেলো, রাজসভায় রাজা শুধু লক্ষ্মীর কথাই শুনছেন; অন্য কারও কথা শুনছেন না। এতে অন্যদের মনে হিংসা জন্ম নিল। লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে তারা চক্রান্তে নামল।



চিত্র: রাজা বিজয়নারায়ণ সিংহের সমাধি

এই চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে রাজা লক্ষ্মীকে হত্যার আদেশ দিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী চতুলের খাদনলস্করের সহায়তায় রাজধানী থেকে পালিয়ে নিজ পুঞ্জিতে চলে গেলেন। লক্ষ্মীর পলায়নে সহায়তার দায়ে রাজা খাদনলস্করকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এতে পাহাড়িরা রাজার উপর অসন্তুষ্ট হয়। তারা সমতলের সাথে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। পাহাড়ি পণ্যের অভাবে সমতলে নানান সমস্যা দেখা দেয়। তিন বছর পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চালু থাকার পর সমতল ও পাহাড়ের সরদাররা মিলে সিদ্ধান্ত নেন, রাজাকে হত্যা করে লক্ষ্মী সিংহকেই রাজা বানানো হবে। তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী রাজা বিজয়নারায়ণকে জয়ন্তীপুরের নিকটস্থ কেন্দ্রিবিলের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় এবং সেখানকার একটি টিলার উপরে তাকে সমাহিত করা হয়। এরপর লক্ষ্মী সিংহ

রাজা হন। তবে তিনি বেশিদিন জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় থাকেননি। অদ্ভূত উপায়ে রাজা হওয়ায় তাকে সবাই মেনে নেয়নি। ১৭৯০ সালে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তিনি নারতিয়াং পুঞ্জিতে চলে যান। তখন নতুন রাজা হন প্রয়াত বিজয়নারায়ণের বৈধ উত্তরাধিকারী ও ভাগিনেয় দ্বিতীয় রামসিংহ। তিনি তাঁর মামার স্মৃতিরক্ষার্থে কেন্দ্রিবিলের সমাধিটি নির্মাণ করেন।



চিত্র: রাজা বিজয়নারায়ণ সিংহের সমাধি

রাজা বিজয়নারায়ণ ও লক্ষ্মীসিংহের ঘটনাগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য জৈন্তিয়ার মানুষের স্মৃতিতে স্থান করে নিয়েছিল। মুখরোচক গল্পের উপাদান হওয়ায় এসব ঘটনার কথা জৈন্তিয়ার প্রতিটি ঘরেই আলোচিত হতো। সময়ের পরিক্রমায় এসব কাহিনী গ্রাম্য গীতিকবিতায় রূপ নিয়েছিল। জৈন্তিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য পুঁথি পাঠের আসরে এসব কবিতা পাঠ করা হতো। এসব কবিতা সংকলনের কাজ শুরু হয় ১৯২০ এর দশকে। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সর্বপ্রথম রাজা বিজয়নারায়ণ, লক্ষ্মীসিংহ ও খাদনলস্করের পুত্র সোনাধনকে নিয়ে প্রচলিত কিছু গীতিকবিতা সংকলিত করে একটি কাব্য-কাহিনী প্রস্তুত করেন। এই কাহিনীটি ‘চতুলের সোনাধনের কবিতা’ নামে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তীতে বিশিষ্ট গবেষক রাজমোহন নাথ জনৈক কানাই খলিফার কাছ থেকে একটি সুদীর্ঘ কাব্য-কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এই কাহিনীটি ১৯৪৭ সালে ‘সোনাধনের গীত’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজমোহন নাথ এর মুখবন্ধে লিখেছেন, “সোনাধনের গীত জৈন্তা রাজপরিবারের প্রেমকাহিনীমূলক একটি কাব্য। এই গীতের আদি রচয়িতা কে জানা যায় না। জৈন্তার প্রাচীন রাজবাটীর সন্নিকটস্থ জাঙ্গাল হাটি নিবাসী কানাই খলিফার নিকট হইতে আমি ১৯৪২ ইংরাজীতে এই গীতটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তখন কানাই মিয়ার বয়স ছিল সত্তর বৎসর। কানাই মিয়া যৌবনে গাজীর গানের খলিফা ছিল এবং গ্রাম্য সম্মেলনে *সোনাধনের গীতটি* গাহিতে তাহার তিন রাত্রি লাগিত। কানাই মিয়া নিরক্ষর; সে তাহার ওস্তাদের নিকট হইতে মুখে মুখে এই গীতটি শিখিয়াছিল। কানাই মিয়ার বিশ্বাস, এই গীতের আদি রচয়িতা শ্রীধর বাণিয়া। শ্রীহট্টের অন্য এক গ্রাম্য গীতিতে শ্রীধর বাণিয়ার ভণিতা পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীধর বাণিয়া বঙ্গদেশের লোক। কানাই মিয়া আমাকে বলিয়াছে- শ্রীধর বাণিয়াকে সে বাল্যকালে জৈন্তায় দেখিয়াছে। জৈন্তার রাজধানীর একটি পাড়ায় তাঁহার বাড়ী ছিল।”

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রচিত ‘চতুলের সোনাধনের কবিতা’ এবং রাজমোহন নাথ কর্তৃক সংগৃহীত ‘সোনাধনের গীত’ মূলত একই কাহিনী হলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবিতা দুটির বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। অধিকাংশক্ষেত্রেই কবিতা দুটির বর্ণনায় কোন মিল নেই। পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক তা নিরূপণ করার কোন উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চতুলের সোনাধনের

কবিতায় বলা হয়েছে, রাজা বিজয় সিংহকে নৌকাদৌড় প্রতিযোগিতার ছলে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সোনাধনের গীতে বলা হয়েছে, গভীর রাতে নৌ-যোগে পাখি শিকারের সময় রাজাকে কৌশলে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল জনৈক মনাই ডুম। কোন বক্তব্যটি সঠিক তা নিরূপণ করা কোন গবেষকের পক্ষেই সম্ভব নয়। শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নাটকীয়তা আরোপ করতে গিয়ে কবিতাগুলোর প্রকৃত রচয়িতারা হয়তো অনেক ঘটনাকেই অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। সোনাধনের গীতের ক্ষেত্রে এমন প্রভাব বেশ লক্ষ্যণীয়। কবিতাটির সংগ্রাহক রাজমোহন নাথ নিজেও এমন ধারণা পোষণ করতেন। তাই তিনি বলেছেন, "এইরূপ গায়ক স্বভাবতঃ কবিত্ব-গুণ সম্পন্ন; আসরে দাঁড়াইয়া গীত গাহিবার সময় সদা সর্ব্বদাই নুতন নুতন পদ রচনা করিতে সমর্থ।"

অধ্যায় বিশ
ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দির

রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের আমলে (১৭৯০-১৮৩২ সাল) জৈন্তিয়া রাজ্যে বেশ কিছু স্থাপনা গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দির। রাজা রামসিংহ এই মঠ বা মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ১৭৯৭ সালে। ভূমি থেকে প্রায় ৪০০ হাত উঁচুতে নির্মিত এই মন্দিরটি ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর স্থাপনা। রাজা রামসিংহ কেন এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন তার কারণ জানা যায় একটি শিলালিপি থেকে। শিলালিপিটি হচ্ছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্মারক। এতে বলা হয়েছে, "রাজা রামসিংহ নিজের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।" শিলালিপিতে আরও বলা হয়েছে, রাজা যেখানে মন্দির নির্মাণ করেছেন সেখানে আগে থেকেই শিবের পূজা হতো।



চিত্র: ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের প্রধান ফটক

মন্দিরটির অবস্থান হচ্ছে জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ঢুপি গ্রামের একটি পাহাড়ের মাথায়। বর্তমানে এই পাহাড়ের নিচেই রয়েছে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক। সিলেট শহর থেকে জৈন্তাপুর উপজেলা সদরে যাওয়ার পথে সারী নদী পার হলেই পাহাড়টি দেখা যায়। সারীঘাট সেতু পার হওয়ার পর হাতের ডানপাশে এর দেখা মেলে। বর্তমানে এটি ঢুপির পাহাড় নামেই পরিচিত। তবে অতীতে এই পাহাড়ের একটি আলাদা নাম ছিল। সেই নামের কথা জানা যায় একটি তাম্রলিপি থেকে। তাম্রলিপিটি হচ্ছে ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের জন্য দানকৃত সম্পত্তির দলিল। এতে বলা হয়েছে, "কপোত পাহাড়ের উপরে শ্রীল রামেশ্বর নামক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর এই মন্দিরের নিত্য পূজার জন্য রাজা রামসিংহ কিছু ভূমি দান করেন।"

তাম্রলিপিটি ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালের। এই লিপির ভাষ্য অনুযায়ী, রাজা রামসিংহ রামেশ্বর শিবলিঙ্গটিকে মন্দিরের ভেতরে স্থাপন করেছিলেন ১৭২০ শকাব্দে। কিন্তু শিলালিপিটির ভাষ্য অনুযায়ী, রাজা রামসিংহ মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন ১৭১৯ শকাব্দে। এই বেমিলের কারণ হয়তো লিপিকরদের অবহেলা বা ভুল। মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে তাম্রলিপিতে কিছু বলা হয়নি। তবে শিলালিপিতে বলা হয়েছে, "মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১৭১৯ শকাব্দের শ্রাবণ কিংবা ফাল্গুন মাসে। পাহাড়ের চূড়ায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে বৃক্ষ পরিবেষ্ঠিত স্থানে সৌধ আকারে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। রাজা এই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন তা আগে থেকেই পূজিত ছিল।"

শিলালিপির পাঠ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঢুপির পাহাড়ের উপরের নির্জন পরিবেশে শিবলিঙ্গটি উন্মুক্তভাবেই পূজিত হতো। ধর্মপ্রাণ রাজা এটিকে সংরক্ষণের জন্য 'রামেশ্বর শিবমন্দির' বানিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মন্দিরের ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মূল মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলেও মন্দির এলাকার দুটি ফটক এবং আরও কিছু স্থাপনা আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। মূল মন্দিরটি ছিল অনেক বড় ও উঁচু। তাই ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এটি ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে মন্দিরের ছোট স্থাপনাগুলো ভূমিকম্পের হাত থেকে অনেকটাই বেঁচে গিয়েছিল। মন্দির এলাকার দক্ষিণের ফটকটি কিছুটা হেলে পড়লেও আজও তা প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বের ছোট ফটকটিও একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

ভূমিকম্পের আগে মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াটিকে ১০-১২ মাইল দূর থেকেও দেখা যেতো বলে শোনা যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হতো, এটি যেনো আকাশের গায়ে ভেসে আছে। পাহাড়ের উচ্চতার কারণেই চূড়াটিকে এতদূর থেকে দেখা যেতো। মন্দিরের আরেকটি জিনিস ছিল বেশ আকর্ষণীয়। এটি ছিল একটি বৃষ বা ষাড়ের মূর্তি। পাথরে নির্মিত এই মূর্তিটি এতোটাই নিখুঁত ছিল যে, দূর থেকে দেখলে এটিকে একটি সত্যিকারের ষাড়ের মতোই জীবন্ত মনে হতো। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই পাথরের ষাড়ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঐতিহাসিক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী দাবি করেছেন যে, ষাড়ের মূর্তিটি মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের নিচেই আছে। ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে শিবলিঙ্গটিকে উদ্ধার করা হলেও ষাড়টিকে উদ্ধার করা হয়নি।



চিত্র: ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের প্রধান ফটক

ভূমিকম্পের পর ঢুপির পাহাড়ের আশেপাশের মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের ইট সংগ্রহ করতো। তাই ইটের স্তুপ কমে গিয়ে একসময় সামান্য দেয়ালসহ মন্দিরের ভিত্তিটির অবয়ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এক শ্রেণির মানুষ এখনও এখান থেকে ইট সরিয়ে নিচ্ছে। এমনকি গুপ্তধনের আশায় কেউ কেউ মন্দিরের ভিত্তিতে অযথা খুঁড়াখুঁড়িও করে থাকে। এসব অপকর্ম বন্ধ না হলে মন্দিরের ভিত্তিটি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। মূল মন্দির ছাড়া অন্যান্য যেসব স্থাপনা আংশিক বা পূর্ণভাবে টিকে আছে সেগুলোও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তা না হলে গুপ্তধনের আশায় কেউ এগুলোর

ক্ষতিসাধন করতে পারে। ঘন জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে চরম অবহেলায় পড়ে থাকা এসব স্থাপনা প্রাকৃতিকভাবেও বিনষ্ট হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, ব্রিটিশ আমলে পাহাড়ের মাথায় পুরো মন্দির এলাকাটি প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং পাহাড়ের নিচ থেকে উপরে উঠার জন্য পাথরে বাঁধানো একটি পথও ছিল। এই পথে 'নয় কুড়ি নয় খান' অর্থাৎ ১৮৯টি সিঁড়ি ছিল। পথের পাশে একটি পানির কূপ ছিল বলেও তারা দাবি করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পাথরের সিঁড়ি, পানির কূপ কিংবা প্রাচীরের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে পাহাড়ে উঠার মাটির পথটি এখনও টিকে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে উঠতে এটি একপর্যায়ে চুলের কাটার মতো কতগুলো বাঁক নিয়ে উপরে পৌঁছেছে। যেখানে পৌঁছেছে সেখানে একটি ছোট ফটক রয়েছে। এই ফটকটিকে মন্দির প্রাঙ্গনের প্রধান ফটক বলে মনে হয় না।



চিত্র: ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের একটি অক্ষত ভবন

এই ফটকটির তুলনায় দক্ষিণ পাশের ফটকটি অনেক বড় এবং কারুকাজসমৃদ্ধ। দেখে মনে হয় যে, দক্ষিণের ফটকটিই মন্দির প্রাঙ্গনের প্রধান ফটক ছিল। পাহাড়ের গায়ের প্রশস্থ রাস্তাটি হয়তো ঘুরে ঘুরে দক্ষিণের ফটকেই পৌঁছেছিল এবং সেদিকেই মানুষ মন্দিরে প্রবেশ করতো। আর প্রশস্থ রাস্তা থেকে হঠাৎ

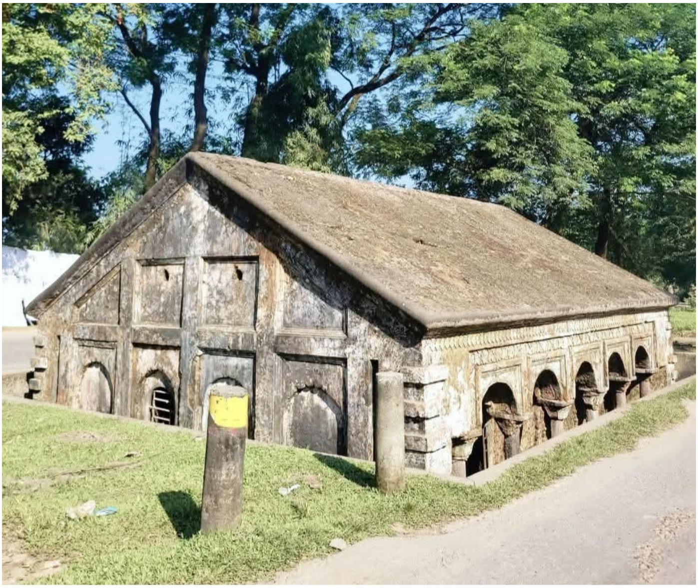
করে চুলের কাটার বাঁক নিয়ে নিয়ে যে রাস্তাটি উপরে উঠেছে সেটি ছিল মন্দিরে ঢুকার একটি বিকল্প ও ছোট রাস্তা। দুটি ফটক ছাড়া মন্দিরের অন্যান্য যেসব স্থাপনা টিকে আছে সেগুলোর কোনটি কী কাজে ব্যবহৃত হতো তা বলার মতো কোন লোক আজ আর বেঁচে নেই। ছোট ফটকটির পাশেই যে দালানঘরটি অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেটির ভেতরে কেউ বসবাস করতো বলেই মনে হয়। কিছু স্থাপনা বা স্থাপনার ধ্বংসাবশেষের উপর এতো ঝোপ-জঙ্গল জন্মেছে যে এগুলোর আকার-প্রকার কিছুই বোঝা যায় না। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে যদি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে এই মঠ বা মন্দির সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।



চিত্র: ঢুপির মঠের প্রধান ফটকের দেয়ালের গায়ে চুন-সুরকির কারুকাজ

অধ্যায় একুশ
ঢুপির সরাইখানা

জৈন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের হাতে নির্মিত যেসব স্থাপনা আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে তার মধ্যে ঢুপির সরাইখানা বা পান্থশালাটি অন্যতম। ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে, সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই স্থাপনাটি বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত স্থাপনা হয়ে উঠলেও বেশিরভাগ মানুষ এর সঠিক ইতিহাস জানেন না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৭৯৭ সালে ঢুপির মঠ নির্মাণের সময়েই রাজা রামসিংহ এই সরাইখানাটি নির্মাণ করেছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষদের বিশ্রামের সুবিধার্থেই রাজা এটি নির্মাণ করেছিলেন। সরাইখানা নির্মাণের জন্য রাজা কেন ঢুপি গ্রামকেই বেছে নিয়েছিলেন তার উত্তর নিহিত রয়েছে তৎকালীন সময়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে।



চিত্র: সারী নদীর তীরবর্তী ঢুপির সরাইখানা

জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অঞ্চলে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। সমতলের মানুষ মূলত নৌকায় বা ভেলায় চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতো। পুরো জৈন্তিয়া সমতলকে সংযুক্ত রেখেছিল অসংখ্য খাল-বিল, হাওর ও নদী-নালা (এখনও রেখেছে)। এই নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ঢুপি গ্রামের সারিঘাট। এখানে সারী নদীর সাথে দুটি ছোট নদী যুক্ত রয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ব জৈন্তিয়ার মানুষ নৌকা যোগে এই তিন নদীর সংযোগস্থলে এসে ভীড়তো এবং এখান থেকে কয়েক মাইল হেঁটে রাজধানীতে পৌঁছত। ফেরার বেলায়ও তারা একই পথেই ফিরতো। এদের অনেকেই ছিলেন ব্যবসায়ী। তারা জয়ন্তাপুরী হাট থেকে বিভিন্ন পাহাড়ি পণ্য-সামগ্রী এনে সারীঘাটের নৌকায় বোঝাই করতেন এবং সেখান থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব জৈন্তিয়ার বিভিন্ন হাটে পৌঁছে দিতেন।



চিত্র: সারী নদীর তীরবর্তী ঢুপির সরাইখানা

সারীঘাট ছিল জৈন্তিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত ‘ঘাট’ বা নৌ-বন্দর। জৈন্তিয়া-মোগলানের যেসব পূণ্যার্থী ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিব মন্দিরে আসতেন তারাও সারীঘাট হয়েই আসতেন এবং সারীঘাট হয়েই ফিরতেন। যেসব ব্যবসায়ী, পূণ্যার্থী, সাধারণ মানুষ এবং রাজস্ব কর্মচারী দূর-দূরান্ত থেকে সারীঘাটে এসে নামতেন তারা আহার, বিশ্রাম ও শুচিতার জন্য সেখানে থামতেন। ফেরার বেলায়ও তাদেরকে সেখানে থেমে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হতো। নৌকায় মাল বোঝাই করতে কিংবা নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে করতে কারও কারও দু-এক দিন চলে যেতো। এসব যাত্রীদের সুবিধার জন্য সারীঘাটে একটি উন্নত বিশ্রামাগার বা সরাইখানা নির্মাণ করা ছিল সময়ের দাবি। রাজা রামসিংহ এই দাবিটি পূরণ করেছিলেন।



চিত্র: ঢুপির সরাইখানার দৃষ্টিনন্দন খিলান

পূণ্যার্থী এবং অন্যান্য যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি সরাইখানা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সারীঘাটের উত্তরপাশে ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত এই সরাইখানায় একসাথে ২০-২৫ জন লোক থাকার ব্যবস্থা ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্যের অক্ষত স্থাপনাগুলোর মধ্যে আয়তনে এটিই সবচেয়ে বড়। এটি মূলত একটি দোচালা ঘর। এর পূর্বপাশে একটি বারান্দাও রয়েছে।

বারান্দার পাঁচটি খিলানের গায়ে অনন্য কারুকাজ রয়েছে।[2] ঘরের দক্ষিণের দেয়ালেও চমৎকার কারুকাজ রয়েছে। অত্যন্ত মজবুত হওয়ায় এই দোচালা ঘরটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পেও ধ্বংস হয়নি। ঘরটি প্রায় পুরোপুরিভাবেই অক্ষত আছে। তবে ঘরের সাথে সংযুক্ত একটি জলাধার বিলুপ্ত হয়েছে। পাথরে বাঁধানো এই জলাধারটি ছিল সরাইখানায় আগত অতিথিদের গোসলের পানির উৎস।



চিত্র: ঢুপির সরাইখানার খিলানের গায়ে চুন-সুরকির কারুকাজ

ব্রিটিশ আমলে সিলেট-শিলং রাস্তা তৈরীর সময় জলাধারটি ভরাট করে এর উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন দোচালা ঘরটির অবস্থান ছিল রাস্তার পশ্চিমে। সিলেট-শিলং রাস্তাটি বর্তমানে দুই দেশে বিভক্ত। রাস্তার যতটুকু বাংলাদেশে আছে তা সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক নামে পরিচিত। এই

[2] আকৃতির বিচারে এই পাঁচটি খিলান হচ্ছে গোলাকার খিলান (Roman/Circular Arch)। এগুলো ছয়টি খুঁটির উপরে নির্মিত। এগুলোর গায়ে চমৎকার ফুল ও পাতার নকশা রয়েছে।

রাস্তাটিকে প্রশস্থ করার সময় দোচালা ঘরটিকে ভেঙ্গে ফেলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। স্থানীয়রা এতে আপত্তি জানালে ঘরটিকে বাঁচিয়ে রেখে এর পশ্চিমপাশ দিয়ে রাস্তা বানানো হয়। তখন থেকে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের যানবাহনসমূহ ঘরটির দুই পাশের দুটি আলাদা লেন দিয়ে চলাচল করছে। তবে যেকোন সময়ে ভারী যানবাহনের ধাক্কায় (দূর্ঘটনাবশত) এই মূল্যবান পুরাকীর্তিটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

অধ্যায় বাইশ
সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির

জৈন্তিয়া রাজ্যের একটি মন্দিরের কথা আজও কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় স্থান পায়নি। এর অবস্থান জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে বেশ দূরে। বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্রিখেল গ্রামে এর অবস্থান। এই গ্রামটি আকারে বেশ বড়। চতুলবাজার-লালাখাল রাস্তাটি এই গ্রামের এক পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই রাস্তার পশ্চিমপাশে মূল গ্রামের ভেতরে ঢুকলে একটি পাহাড়ের নিচে এক জোড়া পুরাতন মন্দিরের সন্ধান মেলে। স্থানীয়দের কাছে এটি সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির নামে পরিচিত। সুদূর অতীতে সতনাথ ছিলেন ভিত্রিখেল গ্রামেরই একজন সন্ন্যাসী। তাকে নিয়ে কিছু বিস্ময়কর গল্প প্রচলিত আছে। এসব গল্প থেকেই মন্দিরটির ইতিহাস জানা যায়। মন্দিরটির ইতিহাসের আর কোন সূত্র নেই।

কথিত আছে, সন্ন্যাসী সতনাথ একদিন রাজা রামসিংহের সাথে দেখা করার জন্য জয়ন্তীপুরের রাজবাড়িতে হাজির হন। কিন্তু রাজা তখন অন্দরমহলে ব্যস্ত ছিলেন। রাজবাড়ির এক লোক সতনাথকে একথা জানালে তিনি বললেন যে, রাজা আসলে ব্যস্ত নন; তিনি হাতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। ওই লোকটি রাজাকে একথা জানালে রাজা বেশ অবাক হয়ে যান। এর কারণ, তখন তিনি সত্যি সত্যিই হাতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। সতনাথের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে রাজা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং আপ্যায়ন করালেন। কৌশলের সাথে রাজা আবারও এই সন্ন্যাসীর বিশেষ ক্ষমতা যাচাই করলেন। রাজবাড়ির কর্মচারীরা সতনাথের সামনে কয়েকটি কাঠাল রেখেছিল। মাত্র একটি কাঠাল ছাড়া বাকিগুলোর ভেতরে কোন কোষ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, সতনাথ অনেকগুলো কাঠালের মধ্য থেকে সঠিক কাঠালটিই হাতে তোলে নিলেন এবং কোষ বের করে আনলেন। দু-দুবার সতনাথের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে রাজা তাকে খুবই সমাদর করেন এবং পরদিনই ভিত্রিখেল গ্রামে এসে তাঁর জন্য একটি মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এটিই সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির।

অধ্যায় তেইশ
লামনিগ্রামের মোকাম

জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে নির্মিত কিছু স্থাপনার কথা আজও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় স্থান পায়নি। জৈন্তাপুর উপজেলার লামনিগ্রামে এমন একটি স্থাপনার সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি একটি মোকাম বা সমাধিস্থল। কোন একজন বিখ্যাত পির বা দরবেশ এখানে শায়িত আছেন। তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা জানা যায় না। কোন্ রাজা তাঁর সমাধি নির্মাণ করেছিলেন তা-ও জানা যায় না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে, জৈন্তিয়ার রাজাদের আমলে তিনি একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ ছিলেন। তিনি লামনিগ্রামেই বসবাস করতেন। যেহেতু জৈন্তিয়ার রাজারা পির-দরবেশদেরকে বেশ সম্মানের চোখে দেখতেন সেহেতু লামনিগ্রামের এই দরবেশের মৃত্যুর পর সমসাময়িক রাজা তাঁর সমাধিস্থলে একটি দৃষ্টিনন্দন মোকাম বানিয়ে দিয়েছিলেন। স্থানীয়দের কেউ কেউ মনে করেন, তিনি মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত দরবেশ হযরত কাশিম শাহের সফরসঙ্গী হয়ে ব্রিটিশ রাজ থেকে স্বাধীন জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন এবং তৎকালীন রাজার কাছ থেকে ভূ-সম্পত্তি লাভ করে লামনিগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। অথবা তাঁর কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। এজন্য তাঁর কোন বংশধর নেই। তাঁর মোকাম সংলগ্ন বাড়িটিতে যারা বসবাস করছেন তারা ইসমাইল নামের এক ব্যক্তির বংশধর। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ইসমাইল নামের ব্যক্তিটি সুদূর অতীতে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

একসময় মোকামের চারপাশে প্রাচীরের অস্তিত্ব ছিল। এখন সেই প্রাচীরের কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। তবে প্রাচীরের ফটকটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এর মাথায় চমৎকার একটি গম্বুজ রয়েছে। ফটকের গায়ের কারুকার্য্যসমূহ এখনও বেশ স্পষ্ট। এর ঠিক পাশেই রয়েছে দরবেশের কবর বা সমাধি। ইটের উপর ইট সাজিয়ে এই সমাধিটি বাঁধাই করা হয়েছিল। আজও এটি একই অবস্থায় আছে। এর পাশে রয়েছে একটি ছোটখাটো বাতিঘর। রাজাদের আমল থেকে আজ অবধি এই বাতিঘরে বাতি (চেরাগ) জ্বালানো হচ্ছে। মোকামের স্থাপনাগুলো মূলত ইট ও চুন-সুরকি দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল।

তাই পরিবেশগত ক্ষয় থেকে বেঁচে গিয়ে এখনও অনেকটাই টিকে আছে। ভূমিকম্পেও মোকামটির কোন ক্ষতি হয়নি।



চিত্রঃ লামনিগ্রামের মোকাম

অধ্যায় চব্বিশ
সেনগ্রামের হাটকেশ্বর শিবমন্দির

রাজা গৌড়গোবিন্দের আমলে শ্রীহট্ট শহরে হাটকেশ্বর শিব নামে এক প্রসিদ্ধ শিবের উপাসনা হতো। ১৩০৩ সালে মুসলমানদের হাতে গৌড় রাজ্যের পতন হলে গৌড়গোবিন্দ শ্রীহট্ট থেকে পালিয়ে কোন এক অজানা গন্তব্যে চলে যান। তখন থেকে হাটকেশ্বর শিবের রাজকীয় উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়। অদ্ভূত ঘটনা হল, রাজা গৌড়গোবিন্দের পতনের চার শতক পরে মোগলানের চারখাই পরগনার সেনগ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ দাবি করেন যে, তিনি জৈন্তিয়ার বর্ণফৌদ রাজের অন্তর্গত বড়হাওরে এই হাটকেশ্বর শিবকে খুঁজে পেয়েছেন। জৈন্তিয়ায় তখন রাজা জয়নারায়ণের শাসনকাল চলছে। তিনি হঠাৎ একদিন খবর পেলেন যে, মোগলানের সেনগ্রাম নিবাসী আগমবাগীশ উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ মহাদেব শিবের সন্ধান লাভের দাবি করেছেন। রাজা স্বচক্ষে এই শিবকে দেখার উদ্দেশ্যে একদল সৈন্যসহযোগে সেনগ্রাম গমণ করলেন। কথিত আছে যে, রাজা এই শিবকে স্থানান্তরের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর তিনি আগমবাগীশকে এই শিবের সেবায়েত নিযুক্ত করেন এবং সেখানে একটি মন্দির বানিয়ে দেন। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। মন্দিরটিকে জৈন্তিয়ার সীমানার ভেতরে নিয়ে আসার জন্য রাজা চারখাই পরগনাটিকে নিজের অধীনস্ত করে নেন (রাজা জয়নারায়ণের পরেও প্রায় এক দশক ধরে এই পরগনাটি জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল)।

সেনগ্রামের বর্তমান অধিবাসীদের কাছ থেকে হাটকেশ্বর শিব উদ্ধারের যে গল্পটি পাওয়া যায় সেটি হল: আগমবাগীশের একটি গাভী ছিল। গাভীটি প্রতিদিনই নদী পার হয়ে জৈন্তিয়ার বড়হাওরে চলে যেতো। সারাদিন ঘাস-পাতা খেয়ে সেটি আবার নিজে নিজেই ফিরে আসত। একদিন গরুটি বাড়িতে ফিরল না। পরের দিন আগমবাগীশ গাভীটির সন্ধানে বড়হাওরে গেলেন। সেখানে তিনি এক অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলেন। তিনি দেখলেন যে, জঙ্গলের মধ্যে গাভীটি হাটকেশ্বর শিবের ওপর দুগ্ধবর্ষণ করছে। এরপর তিনি শিবশিলাটিকে কোলে তোলে নিয়ে চলে আসলেন নিজের গ্রামে। গ্রামে প্রবেশের পূর্বে তিনি স্নান করতে নামলেন নদীর জলে আর হাটকেশ্বর শিবকে বসিয়ে রাখলেন নদীর পাড়ে। এরপর কিছু অলৌকিক ঘটনার পর নদীর পাড়ের

ঐ স্থানেই শিবশিলাটির পূঁজা শুরু হয়। হাটকেশ্বর শিব আবিষ্কারের এই ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হলে জৈন্তিয়ার রাজার কানেও খবরটি পৌঁছে যায়। রাজা জয়নারায়ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সেনগ্রামে আগমন করেন। রাজার আগমনে আগমবাগীশ কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। তিনি রাজাকে প্রস্তাব দিলেন যে, মহারাজ চাইলে হাটকেশ্বর শিবকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রাজা জয়নারায়ণ শিবলিঙ্গটিকে স্থানান্তরের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর তিনি আগমবাগীশকেই এর পূজক নিযুক্ত করে চলে যান।



চিত্র: হাটকেশ্বর শিবমন্দির (ডানপাশে মন্দিরটিই মূল মন্দির)

এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের *মোসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া* খণ্ডে লিখেছেন, "এই শিব রাজা জয়নারায়ণের সময়ে আগমবাগীশ কর্ত্তৃক সেনগ্রামে নীত হইলে, রাজা তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য সেনগ্রামে আগমন করেন। চূড়খাই সম্ভবতঃ তৎকালেই জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীন করা হয়। জয়ন্তীয়ার শেষ নৃপতি রাজেন্দ্র

সিংহের সময় পর্যন্ত ইহা জয়ন্তীয়ার অধীন ছিল।[3] সেনগ্রামে পৌঁছিয়া রাজা আগমবাগীশকে শিব আনয়নের বিষয়ে জিজ্ঞাসিলে তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন যে ইচ্ছা করিলে মহারাজ মহাদেবকে পুনঃ জয়ন্তীয়াপুরে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু শিব আর স্থানান্তরিত হইলেন না এবং আগমবাগীশকে তাঁহার সেবায়েত নিযুক্ত করা হইল।"

---

[3] অচ্যুতচরণ চৌধুরীর এই দাবিটি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। চারখাই পরগনাটি এতো দীর্ঘসময় ধরে জৈন্তিয়া রাজ্যের অধীনে থাকার কথা নয়। যতদূর অনুমান করা যায়, জয়নারায়ণের পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বড় গোসাঁইয়ের আমলে এটি আবার মোগলানের হাতেই চলে গিয়েছিল।

অধ্যায় পঁচিশ
জৈন্তিয়া রাজ্যের তাম্রলিপি

জৈন্তিয়া রাজ্যে তাম্রলিপির প্রচলন ছিল। লিখিত দলিল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাজা-রানীরা তাম্রপত্র বা তাম্রফলক ব্যবহার করতেন। তাম্রফলকের গায়ে লিপি খোদাই করে দলিল রচনা করা হতো। ঐতিহাসিকরা এমন ৭টি তাম্রলিপির সন্ধান পেয়েছেন। এর সবগুলোই হচ্ছে ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল। জৈন্তিয়ার দুজন রাজা এবং একজন রানী এসব দলিল রচনা করেছেন। তারা ৭টি তাম্রফলকে মোট ৯টি ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল খোদাই করিয়েছেন। এর বাইরেও আরও অনেক দলিল রচিত হয়েছিল বলে অনুমেয়। কিন্তু সেগুলো ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়নি। ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস গবেষকরা অনেক অনুসন্ধানের পর জৈন্তিয়ার মাত্র ৭টি তাম্রফলক উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে ৫টি ফলকের পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার হয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক শ্রী কিশোরী মোহন গুপ্ত এবং শ্রী কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী এসব ফলকের পাঠোদ্ধার করেছিলেন। ব্রিটিশ গবেষক স্যার এডওয়ার্ড গেইটও তাঁর একটি প্রবন্ধে জৈন্তিয়ার তাম্রফলকসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কোন ফলকের পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি।

এক. ১৬৯২ শকাব্দের (১৭৭০ সালের) তাম্রলিপি

জৈন্তিয়া রাজ্যের শেষ প্রতীকী রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপের কাছে জৈন্তিয়া রাজ্যের বিভিন্ন মূল্যবান দলিল সংরক্ষিত ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি এসব দলিলের অধিকারী হয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালের একটি তাম্রফলক। এটি ছিল রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের আমলের একটি ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল। এই দলিলে রাজা তাঁর ধর্মগুরু লীলাপুরী স্বামীকে জয়ন্তীপুরের রাজকীয় কালীমন্দিরসহ ১৯২ কেদার ভূমি দান করেছিলেন। তাম্রফলকটির ভাষ্য অনুযায়ী, ১৬৯২ শকাব্দে রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ধর্মগুরু শ্রী শ্রী লীলাপুরী স্বামীর মুখ থেকে পরমহংস মন্ত্র গ্রহণ করে সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করেন এবং 'শ্রী শ্রীমদ রাজপুরী' নামধারণ করেন। একই সাথে রাজা লীলাপুরীর হাতে রাজকীয় মন্দিরের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ওই মন্দিরের সেবাসহ অন্যান্য ধর্মীয় কাজের নিমিত্তে লীলাপুরীকে ১৯২ কেদার ভূমি

প্রদান করেন। তাম্রফলকে এটাও বলা হয়েছে যে, রাজা তাঁর পরিবার সদস্যদের সম্মতিতেই লীলাপুরী স্বামীর হাতে মন্দির ও ভূ-সম্পত্তি তোলে দিয়েছেন। রাজার পরিবারের যেসব সদস্যের সম্মতিতে দানকার্য্যটি সম্পন্ন হয়েছে তারা হলেন রাজার বোন শ্রীমতী গৌরীকুয়ঁরী, গৌরীকুয়ঁরীর স্বামী শ্রী উরাখাদা কুওর, রাজার ভাগিনেয় (গৌরীকুয়ঁরীর পুত্র) মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ ছত্রসিংহ, রাজার ভাগিনেয়ী (গৌরীকুয়ঁরীর কন্যা) শ্রীমতি সোনাকুয়ঁরী এবং সোনাকুয়ঁরীর স্বামী শ্রী যাতাকুওর। ভূ-সম্পত্তি দানের সাক্ষী হিসেবে তাম্রফলকে আরও দুজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শ্রী উমাউপ্পার লস্কর এবং রাজ্যের সেনাপতি শ্রী মাণিক্য রায়। ফলকে উল্লিখিত তারিখ ১৬৯২ শকাব্দের ১৭ কার্তিক।

জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রলিপি ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো লিপি এটিই। ১৭৭০ সালে রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই তাঁর ধর্মগুরু লীলাপুরী স্বামীর ধর্মনিষ্ঠা ও সদুপদেশে মোহিত হয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর এই লিপিটি খোদাই করিয়েছিলেন। লীলাপুরীর জন্য রাজা একটি রাজকীয় কালীমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং এই মন্দিরের অর্চ্চনাসহ সকল ধর্মীয় কার্যক্রমের জন্য রাজা তাকে বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তিও দান করেছিলেন। লিপিটি হচ্ছে এই দেবোত্তর ভূমি দানেরই দলিল। এটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত। ১৯২০ এর দশকের প্রথমদিকে তিনি প্রতীকী রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপের কাছ থেকে লিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর তিনি এটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং এর উপর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে এই প্রবন্ধটি দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে Jaintiapur Copper Plate Inscription of Badagosayi শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুই. ১৭১০ শকাব্দের (১৭৮৮ সালের) তাম্রলিপি

রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রীর নাম ছিল কাশাসতী। তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এর পুরোটাই তিনি দান করে দিয়েছিলেন বলে অনুমেয়। জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রফলক (মোট সাতটি) ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে চারটিই হল রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল। এসব তাম্রফলকের একটিতে তিনটি পৃথক সময়ের ভূমিদানের কথা লেখা রয়েছে। আর বাকী তিনটিতে আরও তিনটি সময়ের ভূমিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্যার

এডওয়ার্ড গেইট এবং অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত এসব তাম্রফলকের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাদের রচনা থেকে জানা যায়, রানী কাশাসতী রাজা বড়গোসাঁইয়ের পরবর্তী চারজন রাজার সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তাম্রফলকের দলিলে দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন।

রানী কাশাসতীর ভূমিদানের প্রথম তাম্রফলকটি ১৭১০ শকাব্দ বা ১৭৮৮ সালের। এতে রানী কর্তৃক লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। ১৭২৩ শকাব্দে রানী আরও কিছু ভূমিদান করেন। ১৭১০ শকাব্দের ফলকটির উল্টোপাশে এই ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই লিপির নিচের কিছু অংশ খালি ছিল। ১৭২৫ শকাব্দে সেখানেও নতুন ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। কেন এমন করা হল সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা কিছু বলেননি। এর সম্ভাব্য কারণ তাম্রফলকের দুষ্প্রাপ্যতা (সে যুগে তামা ছিল একটি মূল্যবান ধাতু এবং তাম্রফলক খুব একটা সহজলভ্য ছিল না)। তিনটি আলাদা ভূমিদানের তথ্য সম্বলিত এই ফলকটি জৈন্তিয়ার শেষ প্রতীকী রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপের মালিকানায় জৈন্তিয়া রাজবাড়ীতেই সংরক্ষিত ছিল। ব্রিটিশ গবেষক স্যার এডওয়ার্ড গেইট এটির সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানেই। Some Notes on Jaintia History (1895) শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি এর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এটির পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি।

ফলকটির পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার করেছিলেন অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত। তিনি ১৯২২ সালে জৈন্তিয়ার রাজবাড়ীতে গিয়ে এর লিপিত্রয় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এরপর তিনি এই ফলকটি নিয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা ১৯৩৩ সালে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত আসাম রিসার্চ সোসাইটির জার্নালের ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তিনি ফলকের লিপিত্রয়ের ইংরেজি অনুবাদ তোলে ধরেছেন। এই অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, ফলকটির এক পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে, “জয়ন্তীপুরের পুরন্দর রাজা বড়গোসাঁইয়ের রানী এই মর্মে লিখছেন যে, কালিকাদেবীর সন্তুষ্টির জন্য আমি সকল স্বত্ত ত্যাগ করে গোবিন্দপুর গ্রামের ২২ হাল ভূমি প্রজাসহ দান করলাম। শ্রী গৌরিকুমারী, শ্রী সোনাকুমারী, শ্রী জয়ন্তীকুমারী এবং রাজা শ্রী শ্রী বিজয়নারায়ণের সম্মতিতে শ্রী-লীলাপুরী সন্ন্যাসীর আবাসস্থলে (মঠ) প্রতিষ্ঠিত শ্রী-শ্রী-কালিকাদেবীর পূজার জন্য এই অনুদান সম্পন্ন হল। (এই অনুদানের

প্রমাণ হিসেবে) ১৭১০ শকাব্দের পৌষ মাসে এই তাম্রলিপিটি রচিত হল। এই তাম্রলিপির লেখককেও (তাম্রলিপি লেখার জন্য) চার হাল ভূমি দেওয়া হল। এর মধ্যে দুই হাল নয়াবনখলা থেকে এবং বাকি অংশ দলইকান্দি গ্রামের পূর্ব থেকে দেওয়া হল। গোবিন্দপুর গ্রামের চারণভূমি ও বিল থেকেও কিছু ভূমি দেওয়া হল।" এরপর ফলকে আরও দুটি ভূমি দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফলকটির অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে, "১৭২৩ শকাব্দের ২৫ আষাঢ় তারিখে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী রানী কাশাসতী কালীর সেবার নিমিত্তে নয়াবন সংলগ্ন পূর্বফৌদ গ্রামের আড়াই হাল অর্থাৎ ত্রিশ কেদার ভূমি দান করেছেন।" এই অংশের নিচে লেখা রয়েছে, "১৭২৫ শকাব্দের ১৩ অগ্রাহায়ণ তারিখে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী রানী কাশাসতী শ্রী-রাধা-কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য এবং উজানীনগরে অবস্থিত কালীর মঠের দুটি দোলায় চড়িয়ে (রাধা-কৃষ্ণকে) দোলযাত্রা পালনের জন্য দলইকান্দি গ্রামের দুই হাল অর্থাৎ চব্বিশ কেদার ভূমি দান করেছেন। এই ভূমি আট হাত লম্বা রড দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছে।"

তিন. ১৭২৫ শকাব্দের (১৮০৩ সালের) তাম্রলিপি

জৈন্তিয়া রাজ্যের তাম্রলিপি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে স্যার এডওয়ার্ড গেইটের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত। তিনি ১৭২৫ সালের একটি তাম্রফলক আবিষ্কার করেছিলেন যা স্যার এডওয়ার্ড গেইটের হস্তগত হয়নি। এই ফলকে রানী কাশাসতীর ভূমিদানের একটি দলিল লিপিবদ্ধ ছিল। ফলকটির প্রাপ্তিস্থান ছিল জৈন্তিয়ার ডৌডিক গ্রাম। তাই অধ্যাপক গুপ্ত এটিকে 'ডৌডিক তাম্রফলক' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এর লিপি নিয়ে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যা ১৯২৩ সালে দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ফলকটি লেখা হয়েছিল ১৭২৫ শকাব্দের ২২ কার্তিক তারিখে। অধ্যাপক গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে ফলকের লিপির যে ইংরেজি অনুবাদ তোলে ধরেছেন তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ।

ফলকটিতে লেখা রয়েছে, "১৭২৫ শকাব্দে (জ্যোতির্বিদ্যার ভাষায় বর্ণিত) এই জয়ন্তীপুর শহরে রাজা রামসিংহের সম্মতিতে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী কাসাঙ্গাদেবী (রানী কাশাসতী) কিছু ভূমি দান করলেন যা ছিল রাজা বড়গোসাঁইয়ের রেখে যাওয়া (রানীর কাছে) সম্পত্তি। নিজ পুত্রদের সাথে

আলোচনা করে কনিষ্ঠদের সম্মতি নিয়েই শ্রী বাসুদেবের ভূধর মূর্তির সেবায় এবং অবদূতদের প্রভু শম্ভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রানী এসব ভূমি দান করেন। শিব, অবদূতদের প্রভূ, জগন্নাথ এবং ভূধর, ডৌডিক গ্রামে অবস্থানরত বাসুদেবের অবতারের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাজা বড়গোসাঁই সিংহের স্ত্রী মহাদেবী (রানী) শ্রীমতী কাশাসতী পিল্লাকান্দি গ্রামের আধা যষ্টি এবং ধর্মপুর গ্রামের আধা যষ্টি ভূমি দান করেন।



চিত্রঃ ডৌডিক গ্রামে প্রাপ্ত ১৭২৫ শকাব্দের তাম্রলিপি

পিল্লাকান্দি গ্রামের সীমানা হল- পূর্বদিকের ভূমি নন্দিরাইয়ের অর্ধেকের সাথে সংযুক্ত, পশ্চিমদিকের ভূমি ধনপুরের সাথে সংযুক্ত, উত্তরদিকের ভূমি চাউরা ও ধনপুরের সাথে সংযুক্ত এবং দক্ষিণদিকের ভূমি জয়ন্তীপুর ও কাছাইরকান্দির সাথে সংযুক্ত। ধর্মপুর গ্রামের সীমানা হল- পূর্বদিকের ভূমি চাউরার সাথে

সংযুক্ত, পশ্চিমদিকের ভূমি শিবনগরের সাথে সংযুক্ত, উত্তরদিকের নদীর নাম ধারাপাড়িয়া এবং দক্ষিণদিকের ভূমি ধনপুর এবং পিল্লাকান্দির সাথে সংযুক্ত। অতীতে বাধাঘাটের শিবলিঙ্গের সেবার জন্য এই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান থেকে হরিপালকার আধা হাল ভূমিসহ চার হাল ভূমি দান করা হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে এই ভূমিটুকু বাদ দিয়ে পুরো জনপদের চব্বিশ হাল ভূমি প্রজাসহ দান করা হল।

এটাও সত্য যে, এসব ভূমির উপর আমার বা আমার ছেলের কোন মালিকানা রইল না। পরবর্তীতে কেউ এসব ভূমি কেড়ে নিতে পারবে না। এই অনুদান অবদূতদেরই কৃতিত্ব। এতে আমার কোন গৌরব নেই। বিদ্বানরাই এর বিচার করবেন। কার্তিক মাসের ২২তম দিনে এই দলিলটি রচিত হল।”

চার. ১৭২৭ ও ১৭৩৫ শকাব্দের (১৮০৫ ও ১৮১৩ সালের) তাম্রলিপি

স্যার এডওয়ার্ড গেইট জৈন্তিয়ার পাঁচটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনটিই ছিল রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল। এগুলো ছিল ১৭১০, ১৭২৭ ও ১৭৩৫ শকাব্দের তাম্রফলক। Some Notes on Jaintia History প্রবন্ধে তিনি বেশ সংক্ষিপ্তাকারে এসব তাম্রফলকের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। গেইট সাহেব পুরানো দলিলের পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে সাধারণত অনুবাদকদের সাহায্য নিতেন। বৃহত্তর আসাম ও সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি মূলত তাদের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। জৈন্তিয়ার তাম্রফলকগুলোর পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি যেসব অনুবাদকদের উপর নির্ভর করেছিলেন তারা নিজেদের কাজে খুব একটা সফল হতে পারেননি। ধারণা করা যায় যে, ফলকগুলোর পরিভাষা বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য হওয়ায় তারা এগুলোর পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি; যতটুকু পাঠোদ্ধার করেছিলেন গেইট সাহেব তাঁর প্রবন্ধে ততোটুকুই উল্লেখ করেছেন। ১৭২৭ শকাব্দের ফলকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে গেইট সাহেব লিখেছেন, এটি ছিল বিধবা রানী কাশাসতী কর্তৃক নিত্যানন্দ গোস্বামীকে ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল। গেইট সাহেব এটাও উল্লেখ করেছেন যে, নিত্যানন্দ গোস্বামী ছিলেন রাজা রামসিংহের ধর্মগুরু। গেইট সাহেব তাঁর প্রবন্ধে ফলকটি সম্পর্কে যা লিখেছেন হুবহু তা নিম্নরূপ।

(4) *Copper plate, dated* 1727 *Çaka.*

This, like No. (2), records a grant by Kāsā Satī, widow of Baṛa Guçāĩ, the donee being one Nityānanda, the Guru of Rājā Rāma-simha.

১৭৩৫ শকাব্দের ফলকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে গেইট সাহেব লিখেছেন, এটি একই নারীর (কাশাসতী) আরেকটি ভূমিদানের দলিল যাতে তিনি রাজা রামসিংহের সম্মতিতে বাসুদেব, জগন্নাথ ও ভূধরের উপাসনার নিমিত্তে কিছু ভূমি দান করেছিলেন। গেইট সাহেব তাঁর প্রবন্ধে ফলকটি সম্পর্কে যা লিখেছেন হুবহু তা নিম্নরূপ।

(5) *Copper plate, dated* 1735 *Çaka.*

This is another grant by the same lady, with the consent of Rājā Rāma-simha, of some land for the worship of the idols of Vasudēva, Jagannātha and Bhūdhara.[1]

[1] A curious feature about all these copper plates is that the seal at the top of them is almost identical with the device on the coins of the kings of Tipperah.

পাঁচ. ১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালের) তাম্রলিপি

জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্য সবচেয়ে দীর্ঘসময় রাজত্ব করেছিলেন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ। ১৭৯০ সাল থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত তিনি জৈন্তিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কমপক্ষে দু'বার দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। দুটি তাম্রলিপি থেকে তা প্রমাণিত হয়। এর একটি ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালের এবং অপরটি ১৭৩১ শকাব্দ বা ১৮০৯ সালের। স্যার এডওয়ার্ড গেইট জৈন্তিয়ার যে পাঁচটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালের ভূমিদানের তাম্রফলক। এই ফলকটি সম্পর্কে গেইট সাহেব তাঁর Some Notes on Jaintia History প্রবন্ধে বলেছেন, "In this plate is set forth the grant by Raja Rama-simha of some land for the temple of Siva which had been erected by him at Dhupi." এই ফলকটি অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্তেরও হস্তগত হয়েছিল।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত জানতে পারলেন যে, জৈন্তিয়াপুর থানার ঢুপির মন্দিরের (ভগ্নপ্রায়) মোহন্তের কাছে একটি তাম্রফলক

রয়েছে। এই খবর পাওয়ার পরপরই তিনি জৈন্তাপুর চলে যান এবং ঢুপির মন্দিরের মোহন্তের কাছে রক্ষিত তাম্রফলকটি পর্যবেক্ষণ করেন। ফলকের লিপি পাঠ করে তিনি জানতে পারলেন যে, রাজা রামসিংহ কপোত পাহাড়ের উপরে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং ১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালে) জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই মন্দিরের সেবায়েতকে বেশ কিছু ভূমি দান করেছিলেন। ফলকে উল্লিখিত এই কপোত পাহাড়টি জৈন্তিয়ার ঢুপি গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে এটি ঢুপির টিলা বা ঢুপির পাহাড় নামে পরিচিত। ১৭২০ শকাব্দে রাজা রামসিংহ এই পাহাড়ের উপরে নির্মিত মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন এবং এর সেবায়েতকে আটটি উর্বর ভূমি দান করেছিলেন। ফলকটিতে মন্দিরের সেবায়েতকে 'রুখড়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, কপোত পাহাড়ের উপরে নির্মিত মন্দিরটির নাম রামেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুখড়ের ভরণপোষণের জন্য রাজা আটটি চাষযোগ্য ভূমি দান করেছিলেন। ফলকটিতে জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রদেশ বা পরগনাগুলোকে বলা হতো 'রাজ'। জয়ন্তীপুর রাজ ও খরিল রাজ এর উদাহরণ। ফলকে উল্লিখিত 'দেশমুখ' (অর্থাৎ দেশের প্রধান) শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, 'দেশ' নামে আরও উপবিভাগ বা জেলা ছিল, যার প্রত্যেকটি 'দেশমুখ' (দেশমুখ্য) উপাধিধারী একজন প্রশাসকের অধীনে ছিল।

ফলকটির পাঠোদ্ধারের পর অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত সিলেট শহরে ফিরে যান এবং এর উপর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন যা ১৯২২ সালে দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'রামসিংহের ঢুপি তাম্রলিপি, ১৭২০ শকাব্দ'। অধ্যাপক গুপ্ত এই প্রবন্ধে ফলকের লিপির যে ইংরেজি অনুবাদ তোলে ধরেছেন তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, "কপোত পাহাড়ের উপরে শ্রীল রামেশ্বর নামক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর এই মন্দিরের নিত্য পূজার জন্য রাজা রামসিংহ কিছু ভূমি দান করেন। ১৭২০ শকাব্দের এক রবিবারে মন্দিরের রুখড়কে এসব ভূমি দেওয়া হয়। (লাইন ১-৪) ১৭২০ শকাব্দে কপোত পাহাড়ের মন্দিরে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনের পর জয়ন্তীপুরের পুরন্দর (অর্থাৎ রাজা) রাজশ্রেষ্ঠ শ্রী শ্রী রামসিংহ তাঁর (রুখড়ের) ভরণপোষণের জন্য আটটি ভূমি দান করেন। (লাইন ৪-৭) এসব ভূমির আয় দিয়ে যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে তারা হলেন: পরিব্রাজক শ্রী রুখড়, তাঁর শিষ্যগণ এবং

শিষ্যদের শিষ্যগণ। আটটি খণ্ডে বিভক্ত এসব ভূমির বর্ণনা নিম্নরূপ। (লাইন ৭-৯) প্রথম ভূমিটি এই পাহাড়ের উত্তরে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে মূর্তিধর নামক এক দেশমুখের (আক্ষরিক অর্থে, দেশ বা জেলার প্রধান) ভূমি রয়েছে। এর পশ্চিম পাশে একটি মাটির শৈলশিরা (সেতু) রয়েছে। এর উত্তরের এলাকাটি দুইতলাভিটি নামে পরিচিত আর দক্ষিণে রয়েছে এই পাহাড়। এই ভূমিটি জয়ন্তীপুর রাজের (প্রদেশ বা পরগনা) অন্তর্গত চৈলাখেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে দুইশত কর্ষণ মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। (লাইন ৯-১৩) দ্বিতীয় ভূমিটি এই পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। এর পূর্ব ও পশ্চিমে শৈলশিরা রয়েছে। উত্তরে নয়াখেলের অধিবাসীদের ভূমি রয়েছে এবং দক্ষিণে তাদের ঘরবাড়ি রয়েছে। এই ভূমিটি তাদের কাছ থেকেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (লাইন ১৩-১৫) ছয় কেদারের তৃতীয় ভূমিটি এই পাহাড়ের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এটি মূর্তিধরের কাছ থেকে একশত চল্লিশ কর্ষণ মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। ছয় কেদারের চতুর্থ ভূমিটি নয়াখেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ছয় কেদারের পঞ্চম ভূমিটি ষাট কর্ষণ মূল্যের বিনিময়ে শ্রী-যুদা নামক এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। (লাইন ১৫-১৯) বারো হালের ষষ্ঠ ভূমিটি জগাদুভিয়াখলা নামে পরিচিত। এটি খরিল রাজে (প্রদেশ বা পরগনা) অবস্থিত। এই ভূমিটি অন্য একটি ভূমির সাথে বদল করা যাবে। সেটি বরবক্রের নিকটবর্তী তপাইবিলের বনভূমি অঞ্চলের বসতিপূর্ণ অংশের (খলাংগনি) সাথে সংযুক্ত রয়েছে। (লাইন ২০-২২) চার হালের সপ্তম ভূমিটি বনবাউরভাগে অবস্থিত। এটি সেনাপতির কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (লাইন ২২-২৩) অষ্টম ভূমিটির পূর্বপাশে হৌলিসা নামক জলাভূমি (বিল) রয়েছে। পশ্চিমে রয়েছে গোভাদা নামক একটি জায়গা। উত্তরে রয়েছে শ্রীপুর এলাকা আর দক্ষিণদিকে রয়েছে বীরধলের উত্তর সীমানা। এই ভূমিটি রাণীর (মহাদেবী) কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (লাইন ২৩-২৬)। যদি কেউ শিবের জন্য দানকৃত এসব ভূমি দখল করেন তাহলে তিনি হবেন একজন হারামখোর এবং এই জগতের মঙ্গল বিনাশকারী। তারিখঃ শকাব্দ ১৭২০, জ্যৈষ্ঠ মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে (লাইন ২৮)।”

ছয়. ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) তাম্রলিপি

১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালের) তাম্রফলক ছাড়াও আরেকটি তাম্রফলকে রাজা রামসিংহের ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এবং

অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত এটির সন্ধান পাননি। এটির সন্ধান পেয়েছিলেন বিশিষ্ট গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল ছাতকের একটি গ্রামে। সেখানেই তিনি রাজা রামসিংহের ভূমিদানের তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিজ গ্রামের এক প্রতিবেশী তাকে ফলকটি দেখিয়েছিলেন। এটি ছিল ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) একটি তাম্রফলক। এই ফলকে রাজা রামসিংহ কর্তৃক জনৈক বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীকে ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। এই বলরাম ছিলেন ছাতকের অধিবাসী। তাঁর মূল নাম ছিল বলরাম গোস্বামী। তিনি সংসারবিমুখ হয়ে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ছাতক থেকে জৈন্তিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন এবং লোকজনের কাছে বৈষ্ণবাধিকারী উপাধী লাভ করেছিলেন। ধার্মিকতা ও কঠোর তপস্যার জন্য বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠায় তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ তাকে ২৪ কেদার ভূমি দান করেছিলেন। এই ভূমিদানেরই দলিল হল ১৭৩১ শকাব্দের তাম্রফলক। বলরাম গোস্বামীর পরিবারের উত্তরসূরীরা এই ফলকটিকে বেশ যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রাখতেন।

গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীকে যিনি ফলকটি দেখিয়েছিলেন তিনি ছিলেন বলরাম গোস্বামীর ভাইয়ের বংশধর। তাঁর নাম ছিল মদন মোহন গোস্বামী। এই পরিবারটির সাথে জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল। শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড' (পৃষ্ঠা ২৭৯) থেকে জানা যায়, বলরাম গোস্বামীর পূর্বপুরুষ শ্রী রাম গোবিন্দ গোস্বামী ছিলেন একজন বিখ্যাত যোগী বা যোগ সাধক। তিনি রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের আমন্ত্রণে ছাতক থেকে জৈন্তিয়ায় গিয়েছিলেন এবং রাজাকে যোগ ব্যায়ামের আটটি উপাদান (যোগাঙ্গ) শিখিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে রাজা তাকে গুরুদক্ষিণাস্বরুপ অনেক ধনসম্পদ দান করেছিলেন। এর কয়েক দশক পরে জৈন্তিয়ায় পদার্পণ করেছিলেন বলরাম গোস্বামী। মদন মোহন গোস্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, বলরাম সংসারজীবন ত্যাগ করে ছাতক থেকে জৈন্তিয়ায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার পার্বত্য অঞ্চলে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন।

বলরাম জৈন্তিয়ায় ভগবান বিষ্ণুর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজে এর সেবায়েত ছিলেন। সম্ভবত একারণেই তাঁকে বৈষ্ণবাধিকারী বলা হতো।

ধার্মিকতা ও ধর্মীয় তপস্যার জন্য তিনি স্থানীয় লোকজনের কাছে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং অনেকে তাঁর শিষ্যও হয়েছিল। তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের কানে এসব খবর পৌঁছলে তিনি এই নিবেদিতপ্রাণ ধর্মসাধকের প্রতি উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই সাধুপুরুষের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক মূল্যবান জিনিসের পাশাপাশি কিছু ভূমিও দান করেছিলেন। মদন মোহন গোস্বামীর কাছে রক্ষিত তাম্রফলকটি ছিল এই ভূমিদানেরই দলিল। গোস্বামী পরিবারের সাথে জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের সম্পর্কটি মদন মোহন গোস্বামীর সময়েও অটুট ছিল। তখন অবশ্য স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে রাজপরিবারের উত্তরসূরী কুমার ছত্রসিংহ নৃপ জৈন্তিয়াবাসীর কাছে একজন রাজা হিসেবেই গণ্য ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও তাকে একজন প্রতীকী রাজার মর্যাদা দিয়েছিল। মদন মোহন গোস্বামী এই প্রতীকী রাজার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি যখন জৈন্তিয়ায় যেতেন তখন রাজপরিবারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও তাকে বেশ আন্তরিকতা দেখাতো। বলরাম গোস্বামীর মন্দিরটিও তখন পর্যন্ত পুরোপুরি সচল ছিল। রাজা রামসিংহ অতীতে বলরাম গোস্বামীকে যেসব ভূমি দিয়েছিলেন সেগুলো তখনও মন্দিরের আওতায় ছিল এবং এসব ভূমির আয় দিয়েই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ধর্মীয় কার্যক্রম চলতো।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রী কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী তাঁর প্রতিবেশী শ্রী মদন মোহন গোস্বামীর বাড়িতে গিয়ে ১৭৩১ শকাব্দের তাম্রফলকটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর পাঠোদ্ধার করেন। এরপর তিনি এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা ১৯২৯ সালে দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি ফলকটিকে 'ছাতক তাম্রফলক' নামে অভিহিত করেছেন এবং ফলকের লিপির সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ তোলে ধরেছেন। এর বাংলা অনুবাদ হল: ১৭৩১ শকাব্দে রাজা রামসিংহ ভগবান বিষ্ণুর সেবক বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীকে গোসাঁইনপুর ও সুতারগ্রামের দুটি ভূমি দান করেন। ব্রজেশ্বরী ও ব্রজেশ্বরের আরাধনার জন্য রাজা বলরামকে এ দুটি গ্রামের ২৪ কেদার ভূমি দান করেন। প্রথম ভূমিটির পূর্বদিকে রয়েছে মহিহারণ্য ভূমি। পশ্চিমদিকে রয়েছে গরু চলাচলের পথ। উত্তরদিকে রয়েছে আমিরঘরনের দিকে যাওয়ার পথ। আর দক্ষিণ দিকে এই ভূমিটি গুল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। দ্বিতীয় ভূমিটির পূর্বদিকে ভোগখর নামক ভূমি অবস্থিত। পশ্চিমদিকে রয়েছে নক্তির নান। উত্তরদিকে রয়েছে মহিহারণ্য। দক্ষিনদিকেও রয়েছে মহিহারণ্য।

অধ্যায় ছাব্বিশ
জৈন্তিয়া রাজ্যের শিলালিপি

(ঢুপির পাহাড়ের নিচে প্রাপ্ত ১৭১৯ শকাব্দের শিলালিপি)

জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে সৃষ্ট যেসব দলিল ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো চিঠি, কিছু মুদ্রা এবং সাতটি তাম্রফলক। একাবিংশ শতকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের এসব মূল্যবান দলিলের সাথে আরেকটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। এর নাম শিলালিপি। ২০০৭ সালে এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে জৈন্তিয়া রাজ্যের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কিংবা ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানে এটি আবিষ্কৃত হয়নি। এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল পুরোপুরি কাকতালীয়ভাবে। সারীঘাটের নিকটস্থ ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রামেশ্বর শিবমন্দিরের আঙ্গিনার মাটির নিচে এর সন্ধান মিলেছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি বেলগাছের নিচে মাটি খননের সময় এটি পাওয়া গিয়েছিল।



চিত্র: ঢুপির মঠের শিলালিপি

ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত মন্দিরটি একটি স্থানান্তরিত মন্দির। বিগত শতকের গোড়ার দিকে ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত শিবলিঙ্গটিকে পাহাড়ের নিচে স্থানান্তর করে নতুন মন্দির চালু করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঢুপির মঠের সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি (রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ কর্তৃক নির্মিত) ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেখানে ধর্মীয় কার্যক্রম চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরে উপাসনা করতে এসে পূণ্যার্থীরা বেশ অসুবিধায় পড়তেন। তাই একসময় মন্দিরটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের সমতল ভূমিতে একটি নতুন মন্দির চালু করা হয় এবং ভগ্নপ্রায় মন্দিরের শিবলিঙ্গটিকে এখানেই স্থাপন করা হয়। নতুন মন্দিরটিকে পুরাতন মন্দিরের নামেই (রামেশ্বর শিবমন্দির) চালু করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে একটি সাধারণ মাটির ঘরেই এই নতুন মন্দিরের কার্যক্রম চলতো। ২০০৬ সালে মন্দিরটিকে পাকা করা হয় এবং এর চারপাশের মাটি কেটে সমান করা হয়। ২০০৭ সালের ২২ মার্চ রাতে তিনদিন ব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্তন উপলক্ষে এখানে বেশ কিছু পূণ্যার্থী ভীড় করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা কিছুটা অসুবিধায় পড়ে যান। মন্দির প্রাঙ্গনে পানি জমা হওয়ায় তাদের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই পানি অপসারণের জন্য কয়েকজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক রাতের আধারেই একটি নালা খননের কাজ শুরু করে দেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বেল গাছের নীচ পর্যন্ত নালাটি অগ্রসর হওয়ার পর তারা মাটির নিচে একটি ভারী পাথর বা শিলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

একটি সাধারণ পাথর ভেবেই তারা এটিকে নালার পথ থেকে উঠিয়ে মাটির স্তুপের সাথে ফেলে রাখেন। যে স্বল্প আলোর সাহায্যে তারা কাজ করছিলেন তাতে এই পাথরটির কোন বিশেষত্ব তাদের চোখে পড়েনি। পরদিন ২৩ মার্চ সকালে লোকজন দেখতে পায় যে, পাথরটির গায়ে কিছু একটা লেখা রয়েছে। রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় পাথরটির গায়ের কাঁদা কিছুটা পরিস্কার হয়েছিল। তাই পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলো সবার চোখে ভাসছিল। পুরো লেখাটি বেশ দুর্বোধ্য হলেও প্রথম দুটি শব্দ থেকে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথম দুটি শব্দ ছিল "নমঃ শিবা"। তাই মন্দিরের পূণ্যার্থীর ভাবলেন যে, এই পাথরটির গায়ের লিপিতে হয়তো কোন ধর্মীয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই তারা পাথরটিকে পুরোপুরিভাবে পরিস্কার করে মন্দিরের সামনে এনে রাখেন। ইতোমধ্যে এই অদ্ভুত পাথরটির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় শত শত লোক এসে ভীড় করেছিল। তারা গভীর আগ্রহে দেখল যে, নয়টি ঢেউ খেলানো লাইনে এই পাথরটির গায়ে কিছু একটা লেখা রয়েছে। লেখায় ব্যবহৃত শব্দগুলো ছিল দুই শতক আগের প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। বাংলা ও সিলেটি নাগরী হরফের সংমিশ্রণে লিখিত এই সংস্কৃত শব্দগুলোর বেশিরভাগই ছিল দুর্বোধ্য। তবে দু-একটি শব্দ বেশ স্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছিল। যেমন- নমঃশিবা, মন্দির, স্থাপিত, শৈলশীর্ষ, কুজনকলি, শক ১৭১৯ ইত্যাদি। লিপিটি বেশ দুর্বোধ্য হলেও সবাই বুঝতে পারছিল যে, এই লিপিতে জৈন্তিয়ার রাজাদের আমলের কিছু মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

জৈন্তিয়ার পুরাকীর্তিসমূহের চিত্রধারণের কাজে অভিজ্ঞ স্থানীয় আলোকচিত্রী ও কলেজ শিক্ষক মো. খায়রুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব ক্যামেরায় লিপিটির চিত্রধারণ করে তা সাংবাদিকদের হাতে তোলে দেন। স্থানীয় সাংবাদিক নুরুল ইসলাম বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছবিসহ লিপিটির সংবাদ প্রেরণ করেন। একই সাথে এর পাঠোদ্ধারের জন্যও চারদিকে যোগাযোগ চলতে থাকে। শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ লিপিটির কথা জানতে পেরে এর অর্থ উদ্ধারের আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লিপিটির কথা জানাজানি হওয়ার পরদিনই (২৪ মার্চ) শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের উপদেষ্টা এডভোকেট সন্তোষ কান্তি ভট্টাচার্য এর অর্থ উদ্ধারের জন্য সিলেট শহর থেকে জৈন্তাপুরে যান। তিনি লিপিটির পাঠোদ্ধার করে সবাইকে জানালেন যে, এটি মূলত ঢুপির পাহাড়ের উপরে স্থাপিত রামেশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্মারক।

এতে লেখা রয়েছে, "রাজা রামসিংহ পালের অনুমতিতে তদীয় স্মৃতি রক্ষার্থে পাপ বিমোচনের উদ্দেশ্যে অত্র শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হইল। রাম সিংহ রাজার পূর্বেই এই শিব পূজিত হইতেন। পাহাড়ের চূড়ায় অতি সুন্দর মনোরম পরিবেশে বৃক্ষাদি পরিবেষ্ঠিত স্থানে সৌধ আকারে শিবমন্দির নির্মিত হয়। বৈশাখদি মাস বিচারে সম্ভবত শ্রাবণ মাসে তা নির্মিত হয়। অগ্রাহয়নাদি মাস বিচারে তা সম্ভবত ফাল্গুন মাসে নির্মিত হয়। কৈলাশতীর্থ সমতূল্য এই স্থানটি সর্বদায় পাখির কলরবে মুখরিত বৃক্ষাদি শোভিত সিন্ধুর ন্যায় উচ্ছাষিত স্থানে কীর্তনাদি হইত। শ্রী রামসিংহ পাল নামক ভূপাল অর্থাৎ নৃপতির অনুমতিতে তাহা লিখিত হইল। ইতি। ১৭১৯ শকাব্দ।"



চিত্র: ঢুপির মঠের শিলালিপি

লিপিটির অর্থ উদ্ধারের পর এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এটিকে সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তোলে দেওয়া হয়। তৎকালীন জৈন্তাপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন জিল্লুর রহমান। রামেশ্বর শিবমন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমূল্য চরণ পাল এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ তাঁর কাছে পাথরটি হস্তান্তর করেন। তিনি এই মূল্যবান পাথরটিকে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেন জৈন্তাপুর থানা কর্তৃপক্ষকে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম পাথরটিকে থানায় নিয়ে যান। পাথরটিকে দেখার জন্য সেখানেও শত শত লোক ভীড় করেছিল। জৈন্তাপুর থানা কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন বছর ধরে এই শিলালিপিটিকে নিজেদের হেফাজতে রাখেন।

এরপর আদালতের এক আদেশে পাথরটিকে সিলেট শহরস্থ ভাষাসৈনিক মতিন উদদীন আহমদ জাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই জাদুঘরের পরিচালক ডাক্তার মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী বাহারের কাছে পাথরটি হস্তান্তর করেছিলেন তৎকালীন সিলেট জেলার পুলিশ সুপার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তখন থেকে পাথরটি এই জাদুঘরেই রয়েছে। জাদুঘরটির বর্তমান অবস্থান সিলেট শহরের দরগা গেইট এলাকায় অবস্থিত মুসলিম সাহিত্য সংসদের মাহবুব ভবনের সবচেয়ে উপরের তলায়। (বৃহত্তর সিলেটের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাদুঘর এটিই)

এখানে সংরক্ষিত পাথরটিকে পরিমাপ করে দেখা যায় এর ওজন প্রায় ৩৫ কেজি, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯.২৫ ইঞ্চি, প্রস্থ প্রায় ১৩.৭৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩ ইঞ্চি। পাথরের গায়ের লিপিটির চার দিকে ফুল ও পাতার নকশা খোদাই করা রয়েছে। দুটি চতুর্ভুজের মধ্যে এই নকশাটি আবদ্ধ রয়েছে। ছোট চতুর্ভুজের সীমানার মধ্যে লিপিটি খোদাই করা হয়েছে। এটি একটি ত্রিভুজ তরঙ্গ আকৃতির লিপি (triangle waveform script)। এর লাইনগুলো সরল নয়; এগুলো তরঙ্গাকৃতির। প্রতিটি লাইন বা তরঙ্গ চারটি ত্রিভুজ নিয়ে গঠিত হয়েছে। লিপিতে মোট লাইন বা তরঙ্গের সংখ্যা ৯ এবং মোট ত্রিভুজের সংখ্যা ৩৬। এমন অদ্ভুত আকৃতিতে লিপিটি কেন খোদাই করা হল তার কারণ অস্পষ্ট। হয়তো সৌন্দর্য্যের জন্যই এমন করা হয়েছে।

লিপিটি কবে খোদাই করা হয়েছিল তা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এর কারণ লিপির মধ্যেই এর সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে। লিপির শেষ লাইনের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘শক ১৭১৯’। ‘শক’ মানে হল ‘শকাব্দ’। জৈন্তিয়া রাজ্যের বিভিন্ন চিঠিপত্র, মুদ্রা ও তাম্রফলকেও শকাব্দকে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশপূর্ব সময়ে ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলোতে এই বর্ষপঞ্জিটির ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। একসময় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানেও এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জি বা খ্রিষ্টাব্দের সাথে এর ব্যবধান ৭৮ বছর। শকাব্দের সাথে ৭৮ বছর যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই হিসেব অনুযায়ী ১৭১৯ শকাব্দ মানে হল খ্রিষ্টীয় ১৭৯৭ সাল।

জৈন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ ১৭১৯ শকাব্দ বা ১৭৯৭ সালে ঢুপির পাহাড়ের উপরে একটি দৃষ্টিনন্দন শিবন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্মারক হিসেবে তিনি আলোচ্য শিলালিপিটি খোদাই করিয়েছিলেন। এই মন্দিরের কথা আরেকটি লিপিতেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি একটি তাম্রলিপি। তাম্রলিপি মানে হল তাম্রফলকে খোদাইকৃত লিপি। ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ এমন একটি লিপি খোদাই করিয়েছিলেন। এই লিপিতে ঢুপির পাহাড়কে ‘কপোত পাহাড়’ এবং এর উপরে স্থাপিত মন্দিরটিকে ‘রামেশ্বর শিবমন্দির’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জনসাধারণের কাছে এই মন্দিরটি ‘ঢুপির মঠ’ নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ এই মন্দিরের চূড়াগুলো আজও যথাস্থানেই পড়ে আছে।

অধ্যায় সাতাশ
জৈন্তিয়া রাজ্যের মুদ্রা

জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাচীন নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাজ্যটির বেশ কিছু মুদ্রাও রয়েছে। জৈন্তিয়ার ইতিহাস গবেষকরা বিভিন্ন রাজার আমলের মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এসব মুদ্রার গায়ে উল্লিখিত তথ্যসমূহকে কাজে লাগিয়েছেন। মুদ্রাগুলোতে উল্লিখিত শকাব্দের ভিত্তিতে অনেক রাজার সঠিক শাসনকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। অদ্ভূত ব্যাপার হল, জৈন্তিয়ার মুদ্রাগুলোতে শকাব্দের হিসেবে রাজাদের সিংহাসনারোহনের বছরগুলোর উল্লেখ থাকলেও দুটি মুদ্রা ছাড়া অন্যগুলোতে রাজাদের নাম উল্লিখিত হয়নি। মুদ্রাগুলোতে রাজাদের নামের স্থলে রাজধানীর নাম লিখিত হয়েছে। জৈন্তিয়ার রাজধানীর নাম ছিল জয়ন্তাপুর বা জয়ন্তীপুর। মুদ্রাগুলোর গায়ে রাজাদের নামের স্থলে লেখা হয়েছে ‘জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য’। ‘পুরন্দর’ কথাটির অর্থ রাজা আর ‘জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য’ কথাটির অর্থ হল ‘জয়ন্তাপুরের রাজা’। জৈন্তিয়ার সকল পূর্ণমুদ্রা বা কাটরা টাকার গায়ে এই কথাটিই লিখা ছিল। ব্যতিক্রম হল সিকিমুদ্রাগুলো (পূর্ণমুদ্রার এক চতুর্থাংশ মানের মুদ্রা)। সিকিমুদ্রাগুলোর গায়ে এই কথাটি লিখা থাকতো না। এর স্থলে রাজাদের নাম ও উপাধি লিখা থাকতো। ঐতিহাসিকরা মাত্র দুজন রাজার আমলের সিকিমুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। এরা হলেন- রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই এবং রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ।

জৈন্তিয়ার পূর্ণমুদ্রাগুলোর গায়ে রাজাদের নামের স্থলে কেন রাজধানীর নাম লিখা হতো তার কারণ অস্পষ্ট। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে, রাজারা আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ১৫৬৪ সালে কামতা রাজ্যের অধিপতি নরনারায়ণের ভাই ও সেনাপতি চিলারায়ের হাতে জৈন্তিয়া সমতলের সাময়িক পতনের পরই এমন প্রথা চালু হয়েছে। কামতা রাজ্যের কোচ রাজবংশের ইতিহাস ‘বংশাবলি’ থেকে জানা যায়, ১৫৬৪ সালে জৈন্তিয়া দখলের পর কোচ রাজা নরনারায়ণ জৈন্তিয়ার রাজাকে একটি বিশেষ শর্তে মুদ্রা চালু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শর্তটি ছিল- জৈন্তিয়ার রাজা মুদ্রার গায়ে নিজের নাম উল্লেখ করতে পারবেন না; নিজের নামের স্থলে রাজধানীর নাম উল্লেখ করতে পারবেন। বংশাবলি থেকে এই তথ্য পাওয়া গেলেও ওই

সময়কার কোন মুদ্রা ঐতিহাসিকদের হাতে আসেনি। ওই সময়কার মুদ্রাসমূহ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়ার যেসব মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো মুদ্রাটি হল ১৬৬৯ সালের। কোচদের জৈন্তিয়া বিজয়ের এক শতাব্দীকাল পরে চালু হওয়া এই মুদ্রাটির গায়েও কোন রাজার নাম উল্লেখ করা হয়নি। যখন এই মুদ্রাটি চালু হয় তখন জৈন্তিয়ার উপরে কোচদের কোন প্রভাব বিদ্যমান ছিল না। ১৫৮৭ সালে কোচ অধিপতি নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচদের সকল আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল। কোচ শাসিত কামতা রাজ্যটি ভেঙ্গে তখন কোচবিহার ও কোচ হাজো নামে দুটি আলাদা রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন কোচবিহারের অধিপতি। আর চিলারায়ের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ ছিলেন কোচ হাজো রাজ্যের অধিপতি। উভয় রাজ্যের কোনটিই তেমন শক্তিশালী ছিল না। প্রতিবেশীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল সমমর্যাদাভিত্তিক। আনুমানিক ১৬০৭ সালে জৈন্তিয়ার অধিপতি যশোমাণিক কোচবিহারের রাজকন্যাকে (লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা) বিবাহ করে উভয় রাজ্যের মধ্যে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

এর কয়েক বছর পর, ১৬১৩ সালে মোগলদের হাতে কোচ হাজো রাজ্যটির বিলুপ্তি ঘটে। এর ফলে কোচদের শক্তি কেবল কোচবিহার রাজ্যটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোচরা আর কখনোই আঞ্চলিক আধিপত্য অর্জন করতে পারেনি। জৈন্তিয়া দখলের পর কোচ অধিপতি নরনারায়ণ জৈন্তিয়ার মুদ্রায় রাজার নামের স্থলে রাজধানীর নাম উল্লেখের যে শর্ত দিয়েছিলেন তা একটি সাময়িক আদেশ ছিল মাত্র। কয়েক বছর পরেই এর কোন কার্যকারিতা ছিল না। পরবর্তীতে জৈন্তিয়ার রাজারা স্বেচ্ছায় নিজেদের নামের স্থলে রাজধানীর নাম উল্লেখ করেছেন। সংগত কারণেই বলা যায় যে, তারা এই ব্যাপারটিকে একটি রীতি হিসেবেই মান্য করতেন; এর মধ্যে কোচ অধিপতি নরনারায়ণের দেওয়া শর্ত মেনে চলার কোন ব্যাপার ছিল না। রাজাদের কাছে এই রীতিটি অমোঘ বিধান হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এর প্রমাণ দুটি সিকিমুদ্রা। ১৬৫৩ ও ১৭১২ শকাব্দের দুটি সিকিমুদ্রায় রাজাদের নাম রয়েছে।

ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়ার মোট নয়টি পূর্ণমুদ্রা ও দুটি সিকিমুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। সিন্টেং রাজবংশের সকল রাজাই কমপক্ষে একবার করে পূর্ণমুদ্রা চালু করেছিলেন বলে অনুমেয় হলেও সকল রাজার মুদ্রার সন্ধান মেলেনি। মাত্র

আটজন রাজার চালু করা মুদ্রার সন্ধান মিলেছে। এদের মধ্যে একজন দুবার পূর্ণমুদ্রা চালু করেছিলেন। আরও দুজন পূর্ণমুদ্রার পাশাপাশি সিকিমুদ্রাও চালু করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা যেসব পূর্ণমুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে প্রথম মুদ্রাটি (সময়ের বিচারে) ১৫৯১ শকাব্দ বা ১৬৬৯ সালের। আর শেষ মুদ্রাটি ১৭১২ শকাব্দ বা ১৭৯০ সালের। বাকি মুদ্রাগুলো যথাক্রমে ১৫৯২ শকাব্দ, ১৬৩০ শকাব্দ, ১৬৫৩ শকাব্দ, ১৬৯২ শকাব্দ, ১৬৯৬ শকাব্দ, ১৭০৪ শকাব্দ ও ১৭০৭ শকাব্দের। সিকিমুদ্রাদ্বয় যথাক্রমে ১৬৫৩ শকাব্দ ও ১৭১২ শকাব্দের। সবগুলো মুদ্রার গায়েই তরবারি বা কাটারির চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নটির কারণে জৈন্তিয়ার মুদ্রাকে 'কাটরা টাকা' নামেও ডাকা হতো। মুদ্রাগুলোর আরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিভিন্ন যুগের রাজারা অত্যন্ত সচেতনভাবেই মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠের সাধারণ বৈশিষ্টসমূহ রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

মুদ্রার এক পৃষ্ঠে রয়েছে তরবারির চিহ্ন, বন্দুক ও গোলার চিহ্ন, তারকা চিহ্ন, ফুল ও পাতার চিহ্ন এবং সর্বোপরি এর গোল প্রান্তজুড়ে রয়েছে পরপর তিনটি বৃত্তের অস্তিত্ব। তিনটি বৃত্তের দুটি হচ্ছে রৈখিক বৃত্ত। এদের মাঝখানে রয়েছে একটি বিন্দুর বৃত্ত (জৈন্তিয়ার রাজ-প্রতীকেও এমন রৈখিক বৃত্ত ও বিন্দুর বৃত্ত রয়েছে)। সবচেয়ে ছোট বৃত্তটির (রৈখিক) ভেতরের গোল পৃষ্ঠের ডানপাশে একটি খঙ্গা তরবারি বা কাটারির চিহ্ন চোখে পড়ে। এই তরবারির হাতলের দুটি আলাদা অংশ রয়েছে; উপরের অংশের মাথা অনেকটাই গোল আকার ধারণ করেছে। নিচের হাতল থেকে তরবারির ধারালো অংশটি শুরু হয়েছে। এটি মাঝামাঝি জায়গায় কিছুটা স্ফীত হয়ে আবারও ক্রমশ সরু আকার ধারণ করেছে। এর শেষ প্রান্ত খুবই চোখালো ও তীক্ষ্ণ। পুরো তরবারিটিই ধনুকের মতো কিছুটা বাঁকানো। বৃত্তের ভেতরের গোল পৃষ্ঠের বামপাশে রয়েছে একটি বন্দুকের চিহ্ন। বন্দুকটির নল বা ব্যারেল পুরোপুরি সোজা। তবে এর বাঁট বাঁকানো। গোল পৃষ্ঠের দুই পাশে দুটি গোলার চিহ্ন রয়েছে; একটি বন্দুকের পাশে এবং অপরটি তরবারির পাশে। পৃষ্ঠের নিচে রয়েছে তারকা চিহ্ন আর উপরে রয়েছে ফুল ও পাতার চিহ্ন। পৃষ্ঠের চার প্রান্তে অংকিত তরবারি, বন্দুক, ফুল-পাতা ও তারকা চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু লেখা রয়েছে। ১৫৯১ শকাব্দের পূর্ণমুদ্রা ও দুটি সিকিমুদ্রা ছাড়া বাকি সবগুলোতেই এই লেখাটি অভিন্ন। লেখাটি হল- শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য। ১৫৯১ শকাব্দের মুদ্রায় লেখা রয়েছে- শ্রীশ্রী রঘুনাথ পাদপদ্ম পরায়ণস্য। সিকিমুদ্রাদ্বয়ে লেখা রয়েছে- শ্রীশ্রী রাজা বড়গোসাঁই ও শ্রীশ্রী রামসিংহ নৃপবরস্য।

মুদ্রাসমূহের অপর পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য মোটামোটিভাবে সাধারণ হলেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। কোন কোন মুদ্রায় ফুল ও সূর্যের চিহ্ন থাকলেও কোন কোন মুদ্রায় তা নেই। তবে পৃষ্ঠের গোল প্রান্তজুড়ে অংকিত তিনটি বৃত্তের অস্তিত্ব সকল মুদ্রাতেই অভিন্ন। তিনটি বৃত্তের দুটি হচ্ছে রৈখিক বৃত্ত। এদের মাঝখানে রয়েছে একটি বিন্দুর বৃত্ত। দুটি সিকিমদ্রা ছাড়া বাকি মুদ্রাগুলোর পৃষ্ঠজুড়ে লেখা রয়েছে- শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য। এর নিচে রয়েছে শকাব্দের উল্লেখ। একেক মুদ্রায় একেক শকাব্দ লেখা রয়েছে। মুদ্রাগুলোর শকাব্দ আলাদা হলেও এর উল্লেখের রীতিটি অভিন্ন। প্রথমে 'শক' লিখে এর পাশে সংখ্যা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ('শক' মানে শকাব্দ)। এই লেখাকে একটি সরলরেখা দ্বারা উপরের লেখা থেকে আলাদা করা হয়েছে। দুটি সিকিমুদ্রায় অবশ্য উপরের লেখাটি নেই। মুদ্রাদ্বয়ের পৃষ্ঠজুড়ে লেখা রয়েছে 'শক ১৭১২' ও 'সিংহ বাহাদুরস্য ১৬৫৩'।

স্যার এডওয়ার্ড গেইটের 'সাম নোটস অন জৈন্তিয়া হিস্টরি' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, জৈন্তিয়া রাজ্যে কোন একক ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরী হতো না; বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে মুদ্রা তৈরী হতো। জৈন্তিয়ার মুদ্রা তৈরীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতো তামা। একইসাথে রূপা ও দস্তাও ব্যবহৃত হতো। মুদ্রায় খুবই সামান্য পরিমাণে অন্যান্য ধাতুরও অস্তিত্ব থাকতো। ১৮৩৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জৈন্তিয়ার মুদ্রার ধাতব উপাদান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কালকাতার অ্যাসে মাস্টারের কাছে ১৭১২ শকাব্দের দুটি মুদ্রা পাঠিয়েছিলেন। অ্যাসে মাস্টার মুদ্রা দুটির রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে ধাতব উপাদানসমূহের অনুপাত সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। এই রিপোর্টে দেখা যায়, মুদ্রা দুটিতে একই অনুপাতে ধাতব উপাদাসমূহ ব্যবহৃত হয়নি। একটি মুদ্রায় ৫১.২৫ শতাংশ তামা, ২৮.৩৩ শতাংশ রূপা ১৯.৫৮ শতাংশ দস্তা এবং ০.৮ শতাংশ অন্যান্য ধাতুর অস্তিত্ব মিলেছিল। অপর মুদ্রায় ৪৮.৭ শতাংশ তামা, ৩৬.৪৬ শতাংশ রূপা, ১৪ শতাংশ দস্তা এবং ০.৮ শতাংশ অন্যান্য ধাতুর অস্তিত্ব মিলেছিল।

ঐতিহাসিকদের হস্তগত মুদ্রাসমূহের বর্ণনা

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস গবেষকরা ষোড়শ শতকের দুটি মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। এর একটি ১৫৯১ শকাব্দ বা ১৬৬৯ সালের এবং অপরটি ১৫৯২ শকাব্দ বা ১৬৭০ সালের। ঐতিহাসিকদের হাতে আসা জৈন্তিয়ার সবচেয়ে

পুরানো মুদ্রা হচ্ছে ১৫৯১ শকাব্দের মুদ্রা। এর একপাশে লিখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী রঘুনাথ পাদপদ্ম পরায়ণস্য' এবং আরেকপাশে লিখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৫৯১'। এই মুদ্রাটি কোন রাজা চালু করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করা মুশকিল। এর কারণ, ১৬৬৯ সালে মোট তিনজন রাজা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। এরা হলেন- মানসিংহ, প্রতাপ সিংহ এবং লক্ষ্মীসিংহ বা লক্ষ্মীনারায়ণ। এই তিনজন রাজার মধ্যে কোন রাজা এটি চালু করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। তবে লক্ষ্মীনারায়ণ ওই মুদ্রাটি চালু করেননি- এমন দাবি করাটা অযৌক্তিক হবে না। এর কারণ, ঐতিহাসিকরা ঠিক পরের বছরের আরেকটি মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। এই মুদ্রাটি ১৫৯২ শকাব্দ বা ১৬৭০ সালের। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে ছিলেন। তাই এতে সন্দেহ নেই যে, পরের মুদ্রাটি তিনিই চালু করেছিলেন। যদি তিনি আগের বছরের মুদ্রাটি চালু করতেন তাহলে পরের বছরের মুদ্রাটি চালু করার প্রয়োজন হতো না। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৬৬৯ সালের মুদ্রাটি চালু করেছিলেন রাজা মানসিংহ অথবা রাজা প্রতাপ সিংহ আর ১৬৭০ সালের মুদ্রাটি চালু করেছিলেন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ। ১৬৭০ সালের মুদ্রাটির একপাশে লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য' এবং অপর পাশে লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৫৯২'।

১৬৩০ শকাব্দ বা ১৭০৮ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা জয়নারায়ণ সিংহ। তাঁর চালু করা মুদ্রাটি ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। মুদ্রাটির একপাশে লেখা রয়েছে-'শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য' এবং অপর পাশে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৩০'। ১৬৫৩ শকাব্দ বা ১৭৩১ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা বড়গোসাঁই সিংহ। তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'দ্বিতীয় বড়গোসাঁই' নামে পরিচিত। তাঁর চালু করা দুটি মুদ্রা ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। একটি পূর্ণমুদ্রা এবং অপরটি সিকিমুদ্রা (পূর্ণমুদ্রার এক চতুর্থাংশ মানের মুদ্রা)। উভয় মুদ্রার গায়েই উল্লিখিত সালটি হচ্ছে ১৬৫৩ শকাব্দ। পুরানো রীতির অনুকরণে রাজা বড়গোসাঁই রাজধানীর নামে পূর্ণমুদ্রাটি চালু করেছিলেন। কিন্তু সিকিমুদ্রাটি তিনি নিজের নামেই চালু করেছিলেন। এই ব্যাপারটি বেশ অভিনব। জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজের নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁর চালু করা পূর্ণমুদ্রার এক পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৫৩'। তাঁর চালু করা সিকিমুদ্রার এক পৃষ্ঠে

লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী রাজা বড়গোসাঁই' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'সিংহ বাহাদুরস্য ১৬৫৩'।



চিত্র: রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের চালু করা পূর্ণমুদ্রা

১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা ছত্রসিংহ। তাঁর চালু করা মুদ্রার এক পৃষ্ঠে তরবারি, বন্দুক ও তারকা চিহ্ন অংকিত থাকলেও অন্যান্য মুদ্রার মতো ফুল ও পাতার চিহ্নটি নেই। বন্দুকের গোলাও নেই। তবে অন্যান্য মুদ্রার মতোই এই পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য'। মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৯২'। উভয় পৃষ্ঠের প্রান্তবর্তী বিন্দুর বৃত্তদ্বয় বেশ বড় বড় বিন্দু দিয়ে গঠিত হয়েছে।



চিত্র: রাজা ছত্রসিংহের চালু করা পূর্ণমুদ্রা

১৬৯৬ শকাব্দ বা ১৭৭৪ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন রাজা যাত্রানারায়ণ। তিনি দুবার মুদ্রা চালু করেছিলেন। একবার ১৬৯৬ শকাব্দে এবং আরেকবার ১৭০৪ শকাব্দে। রাজা ছত্রসিংহের আমলে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১০,০০০ মুদ্রা পরিশোধ করেছিলেন। এজন্য রাজ্যে কিছুটা মুদ্রা সংকট কাজ করছিল। তাই শাসনকালের অষ্টম বর্ষে তিনি আবারও মুদ্রা চালু করেছিলেন। জৈন্তিয়ার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র রাজা যিনি দুবার মুদ্রা চালু করেছিলেন। প্রথমবার চালু করা মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে লেখা ছিল- 'শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা ছিল- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৯৬'। দ্বিতীয়বার চালু করা মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে লেখা ছিল- 'শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা ছিল- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৭০৪'।



চিত্রঃ রাজা যাত্রানারায়ণের চালু করা পূর্ণমুদ্রা

১৭০৭ শকাব্দ বা ১৭৮৫ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন রাজা বিজয়নারায়ণ। তাঁর চালু করা মুদ্রার এক পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৭০৭'।



চিত্র: রাজা বিজয়নারায়ণের চালু করা পূর্ণমুদ্রা

১৭১২ শকাব্দ বা ১৭৯০ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ। তাঁর চালু করা একটি পূর্ণমুদ্রা ও একটি সিকিমুদ্রা ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। পূর্ণমুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৭১২'। সিকিমুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শ্রীশ্রী রামসিংহ নৃপবরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে- 'শক ১৭১২'।



চিত্র: রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের চালু করা পূর্ণমুদ্রা

অধ্যায় আটাশ
জৈন্তিয়া রাজ্যের সামরিক উপকরণ

জৈন্তিয়া রাজ্য ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজ্যের মধ্যে একটি। আনুমানিকভাবে প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই রাজ্যটি পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। রাজ্যটি কখনো সরাসরি অন্য কোন রাজ্যের অংশ হয়নি (যদিও বার বার এর সীমানা পরিবর্তন হয়েছে)। ভারত উপমহাদেশের যে অল্প কয়টি রাজ্য মহাভারতের যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত টিকে গিয়েছিল তার মধ্যে জৈন্তিয়া অন্যতম। এতো দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজ্যের টিকে থাকার পেছনে মূল কারণ ছিল এর প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক সুরক্ষা এবং মাতৃতান্ত্রিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহের প্রভাব বলয়। সামরিক শক্তির বিচারে জৈন্তিয়া ছিল আর দশটি রাজ্যের মতোই (জৈন্তিয়ার কোন বিশেষ সামরিক শক্তি ছিল না)। কিন্তু কোন প্রতিবেশী রাজাই রাজ্যটিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কামতাপুর, আহোম ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে জৈন্তিয়ার জয়-পরাজয়ের ইতিহাস থাকলেও কারও হাতে রাজ্যটির চূড়ান্ত পতনের কোন ইতিহাস নেই।



চিত্র: জৈন্তিয়ার পাহাড়ি যুবকদের ঐতিহ্যবাহী পোষাক ও অস্ত্র (তীর ধনুক)

জৈন্তিয়া সমতলে সাময়িক বিজয় অর্জন করলেও কোন বহিরাগত শাসক জৈন্তিয়া শাসন করতে পারেননি। ব্রিটিশদের আগ পর্যন্ত জৈন্তিয়া থেকে সকল বিজয়ী শক্তিকেই পিঁছু হটতে হয়েছে। এর পেছনে মূল কারণ হল, জৈন্তিয়া সমতল সর্বদাই পাহাড়িদের প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা সমতলের রাজাকে কোন কর বা রাজস্ব দিত না। কিন্তু সমতলের রাজার বিপদের সময়ে তারাই ঢাল হয়ে দাঁড়াত। পাহাড়িরা কখনোই চাইত না, বাইরের কেউ এসে জৈন্তিয়া সমতল শাসন করুক। এই অঞ্চলকে তারা নিজেদের অঞ্চল হিসেবেই গণ্য করতো। এখানে বাইরের কারও শাসনকে তারা কখনোই মেনে নেয়নি। পার্শ্ববর্তী খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যেও জৈন্তিয়া সমতলের ব্যাপারে এমন মনোভাব কাজ করতো। জৈন্তিয়া সমতলে বহিরাগতদের শাসন রুখতে তারা দু-একবার যুদ্ধেও জড়িয়েছিল। এই ভূখণ্ডের সাথে তাদের কোন স্বার্থসংশ্লিষ্টতা না থাকলেও তারা এখানে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করতো না। জৈন্তিয়া ও খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের এমন মনোভাবই ছিল জৈন্তিয়ার রাজাদের আসল রক্ষাকবচ।

তবে রাজ্যের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে রাজারা পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতি রাখতেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের সামরিক শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল হাতি। রাজারা বুনো হাতি ধরে পোষ মানাতেন এবং সামরিক প্রয়োজনে এগুলোকে ব্যবহার করতেন। মুলাগোল ছিল হাতি ধরার শ্রেষ্ঠ জায়গা। প্রতি বছরই মুলাগোলে বেশ কিছু বুনো হাতি ধরা পড়তো এবং সেগুলোকে পোষ মানিয়ে রাজধানীতে আনা হতো। রাজারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য এসব হাতির বেশিরভাগই বাইরে রপ্তানী করতেন। সারা ভারতেই জৈন্তিয়ার হাতির বিশেষ কদর ছিল। মোগল শাসকরা প্রায়ই সামরিক প্রয়োজনে জৈন্তিয়ার হাতি কিনতেন। ব্রিটিশ আমলেও এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রিটিশ আমলের প্রথমদিকে (যখন জৈন্তিয়া স্বাধীন ছিল) সিলেটের কালেক্টররা জৈন্তিয়ার হাতি কিনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় পাঠাতেন (অবশ্য তারা নিজেরাও 'খেদায়' হাতি ধরতেন)। জৈন্তিয়ার রাজধানী জয়ন্তীপুর ছিল হাতি ব্যবসার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। সারা ভারতের হাতির সওদাগররা ভালো মানের হাতি কেনার জন্য জয়ন্তীপুরে আসতেন। জৈন্তেশ্বরী বাড়িতে সওদাগরদের সামনে হাতি নিলাম করা হতো।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালের গায়ে অংকিত হাতির চিত্র

জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটকটির উচ্চতা এমনভাবে রাখা হয়েছিল যাতে হাতির পিঠে বসেই মাহুতরা এখানে প্রবেশ করতে পারে এবং এখান থেকে বের হতে পারে। বাড়িটির দেয়ালের উচ্চতাও এমন ছিল যে, এখানে সাময়িক সময়ের জন্য হাতিদেরকে আটকে রাখতে কোন সমস্যা হতো না। বাড়িটির দেয়ালের গায়ের হাতির চিত্রসমূহ আজও মনে করিয়ে দেয় যে, একদা এই বাড়িটিকে অস্থায়ী হাতির হাট হিসেবে ব্যবহার করা হতো। হাতির পরে ঘোড়া ছিল জৈন্তিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহন। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতরে সহজে চলাচলের ক্ষেত্রে ঘোড়ার প্রয়োজন হতো। জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যে যেসব দূত চলাচল করতো তারা ঘোড়ায় চড়েই চলাচল করতো বলে অনুমেয়। জৈন্তেশ্বরী বাড়ি এবং বামজজ্ঘা পীঠের দেয়ালে ঘোড়া ও আরোহীর কিছু চিত্র দেখা যায়। এসব চিত্র জৈন্তিয়া রাজ্যে ঘোড়ার ব্যবহারের প্রমাণ। ঘোড়ার পরে জৈন্তিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বাহন ছিল নৌকা। দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাজা ও সৈন্যবাহিনীর লোকজন মাঝেমধ্যে নৌকা ব্যবহার করতেন। রাজা জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণ আক্রমণের সময় একটি নৌবহর নিয়ে বড়হাওর অতিক্রম করেছিলেন বলে শোনা যায়।

সামরিক বাহনের পাশাপাশি জৈন্তিয়ার রাজারা বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রও মজুদ রাখতেন। এসব যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর ধনুক, বর্শা, বল্লম, বুকিদা, খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি, নকাইদাও (একটি বিশেষ ধরণের ছুরি), কামান এবং বন্দুক। জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালে বর্শা ও বল্লমধারীর চিত্র দেখা যায়; তরবারি হাতে নিয়ে চলতে থাকা এক নারীর চিত্রও রয়েছে। কোচ রাজাদের ইতিহাস *বংশাবলি* থেকে জানা যায়, ১৫৬৪ সালে জৈন্তিয়ার রাজা প্রতাপ রায় বা প্রতাপ নারায়ণ কোচদেরকে কিছু সামরিক উপকরণ প্রদান করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ১০০টি ঘোড়া এবং ১০০টি খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি। এছাড়াও তিনি কোচ রাজাকে প্রতি বছর ৭০টি ঘোড়া এবং ৩০০টি নকাইদাও দিতে সম্মত হয়েছিলেন। আহম বুরুঞ্জি থেকে জানা যায়, ১৭০৭-০৮ সালে জৈন্তিয়ায় আক্রমণের সময় আহোমরা ৩টি কামান, ২২৭৩টি বন্দুক এবং ১০৯টি হাতি হস্তগত করেছিল। রাজধানী জয়ন্তীপুরের প্রতিরক্ষার জন্য এর তিনটি প্রবেশদ্বার বা ফটকে মোট ছয়টি কামান বসানো ছিল। প্রতিটি ফটকে এক জোড়া করে কামান বসানো ছিল। এসব কামান আকারে অনেক বড় ও ভারী ছিল।



চিত্রঃ জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালের গায়ে অংকিত বর্শাধারীর চিত্র

ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের পরে এগুলো স্ব-স্থানেই পড়ে ছিল। দীর্ঘদিন এভাবে পড়ে থাকার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একজোড়া কামান সিলেট শহরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। বাকি দুই জোড়া কামান স্ব-স্থানেই ছিল। তবে অযত্নে পড়ে থাকার একপর্যায়ে এগুলো আবর্জনা ও মাটির নিচে আধা-চাপা পড়ে গিয়েছিল। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ রাজমোহন নাথ জয়ন্তীপুরে (নিজপাট) এসে মাটির নিচ থেকে এক জোড়া কামান উঠিয়ে সেখানকার রাস্তার পাশে পেতে রেখেছিলেন। এগুলো ছিল জয়ন্তীপুর নগরীর দক্ষিণের ফটকের কামান। ১৯৫৩ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার কর্তৃপক্ষ এগুলো তোলে নিয়ে যান। বাকী এক জোড়া কামানের মধ্যে একটির কোন তথ্য মিলে না। অপর একটি দীর্ঘদিন ধরে জৈন্তেশ্বরী বাড়ীর সামনে পেতে রাখা ছিল। এই কামানটির সাথে বর্তমান নিজপাটবাসীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃপক্ষ কামানটিকে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে তোলে নিয়ে যান। বর্তমানে এটি ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

জৈন্তিয়া রাজ্যের উপ-রাজধানী বা গ্রীষ্মকালীণ রাজধানী নারতিয়াং পল্লীর প্রতিরক্ষার জন্যও সেখানে কিছু কামান বসানো ছিল। বর্তমানে এগুলো নারতিয়াং মন্দিরে সংরক্ষিত আছে (মোট পাঁচটি)। এই কামানগুলো আকারে কিছুটা ছোট। এগুলোর মুখ সরু এবং এগুলোর সাথে হাতলও যুক্ত রয়েছে। আকৃতির বিচারে এগুলো কিছুটা বন্দুকের মতো (যেহেতু সরু মুখ বা নল যুক্ত রয়েছে)। আহম বুরুঞ্জিতে জৈন্তিয়ার যেসব বন্দুকের কথা বলা হয়েছে এগুলো তারই নমুনা কিনা তা স্পষ্ট নয়। জৈন্তিয়ার মুদ্রায় যে বন্দুকের ছবি দেখা যায় সেটির পিছনের অংশ (বাট) বাঁকানো। কিন্তু নারতিয়াং মন্দিরের কামানগুলো একদম সোজা। তাই এগুলোকে কামান হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। আকারে এগুলো সমান নয়। পাঁচটি কামানের দৈর্ঘ্য পাঁচরকম। ওজনেও এগুলো সমান নয়। বহনের সুবিধার্তেই বোধ হয় এগুলোর ওজন ও আকারে এই পার্থক্য রাখা হয়েছে (সকল মানুষের বহন ক্ষমতা সমান নয়)। তিনটি কামানের হাতলের কড়া রয়েছে ভরকেন্দ্রের কাছে। একটি কামানের হাতলের কড়া রয়েছে ভরকেন্দ্রের বেশ নিচে। বাকি কামানটিতে কোন হাতল যুক্ত নেই। কামানগুলোকে দেখে মনে হয়, এগুলোকে বন্দুকের মতো ব্যবহার করা যেতো। একটি কামান ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুজন লোকের প্রয়োজন হতো। একজন শক্তিশালী লোক কাঁধের ওপর কামান তোলে শরীরের সাথে হাতল চেপে রেখে

লক্ষ্যবস্তুর দিকে নল তাক করতো। আর পেছন থেকে কেউ কামানের ভেতরের বারুদে অগ্নিসংযোগ করতো। বারুদ বিস্ফোরিত হলে নলের ভেতরের ধাতব গুলি প্রচণ্ড বেগে লক্ষ্যবস্তুর দিকে বেরিয়ে যেতো। এগুলোর লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা গাদা বন্দুকের মতোই ছিল বলেই মনে হয়। প্রায়োগিক পদ্ধতির বিচারে এই কামানগুলোকে 'হাত কামান' বলা যেতে পারে।



চিত্রঃ নারতিয়াং মন্দিরে রক্ষিত পাঁচটি হাত কামান

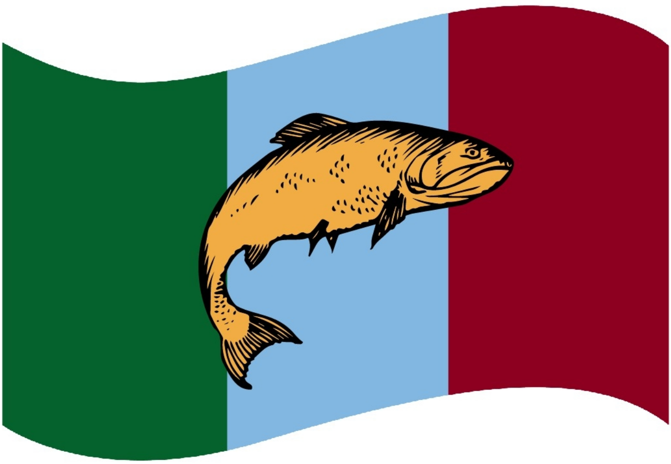
অধ্যায় উনত্রিশ
জৈন্তিয়ার রাজকীয় সীলমোহর ও পতাকা

জৈন্তিয়া রাজ্যের সরকারি দলিলসমূহে একটি রাজকীয় প্রতীক বা সীলমোহরের (Royal Seal) ছাপ থাকতো। ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়ার রাজাদের লেখা চিঠিপত্র, বিভিন্ন চুক্তিপত্র এবং ভূমিদানের দলিল বা তাম্রফলকসমূহে একটি রাজকীয় প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রফলক ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে সেগুলোতে দেখা যায়, একগুচ্ছ শাপলার ওপরে লম্ফমান একটি সিংহের ছবিকে রাজকীয় প্রতীক বা সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, সিংহটি বামদিকে তাকিয়ে রয়েছে। আবার কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, সিংহটি ডানদিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রায় সকল তাম্রফলকেই দেখা যায়, সিংহের নিচে একগুচ্ছ ভাসমান শাপলা রয়েছ। আরও দেখা যায় যে, লম্ফমান সিংহ এবং শাপলা গুচ্ছটি তিনটি পর পর বৃত্তের ভেতরে বন্দী রয়েছে। মাঝখানের বৃত্তটি হচ্ছে বিন্দুর বৃত্ত আর বাকি দুটো হচ্ছে সাধারণ রৈখিক বৃত্ত। তবে কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, তিনটি বৃত্তই বিন্দুর বৃত্ত। আবার কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, লম্ফমান সিংহ এবং শাপলা গুচ্ছটি একটিমাত্র বৃত্তের ভেতরে বন্দী রয়েছে। সকল তাম্রফলকের বৃত্তই প্রায় একই মাপের (১.৮৭৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট)।



চিত্র: জৈন্তিয়ার রাজকীয় প্রতীক বা সীলমোহর

জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রতীকের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলেও এর পতাকা কেমন ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। জৈন্তিয়ার পতাকার কোন ছবি বা বর্ণনা কোন মূল দলিলে নেই। জৈন্তিয়া সমতলের কিছু গবেষকের মতে, পতাকায় সিংহের ছাপ ছিল। কিন্তু জৈন্তিয়া পাহাড়ের গবেষকরা বলেছেন, পতাকায় একটি মাছের ছাপ ছিল। রাজ্যের পতাকা যে সবসময় একইরকম ছিল তা না-ও হতে পারে। আবার, পাহাড় ও সমতলের পতাকা অভিন্ন না-ও হতে পারে। পাহাড়ি প্রবীণদের মুখে জৈন্তিয়ার পতাকার যে বর্ণনা শুনা যেতো তা প্রথমবারের মতো বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন জোয়াই শহরস্থ কিয়াং নাংবাহ সরকারি কলেজের প্রাক্তন ইংরেজি শিক্ষিকা কং ফিরিও পাসলেইন (Kong Phirio Paslein)। *The Jaintia Kings: Information Visualization of Jaintia History and Culture* শিরোনামের একটি গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদনেও জৈন্তিয়ার পতাকার একই বর্ণনা পাওয়া যায়। অধ্যাপক রবি পুভাইয়ার (Prof. Ravi Poovaiah) তত্ত্বাবধানে এই প্রতিবেদনটি রচনা করেছেন জোনাথান সাওইয়ান (Jonathan Sawian).



চিত্র: জৈন্তিয়া রাজ্যের পতাকা

কং ফিরিও পাসলেইন এবং জোনাথান সওইয়ান এর বর্ণনা অনুযায়ী, ব্রিটিশরা আসার আগে জৈন্তিয়া রাজ্যের যে নিজস্ব পতাকা ছিল তার জমিন ছিল তিনটি রং-এ বিভক্ত। এ তিনটি রং হল- সবুজ, আকাশী ও লাল। পতাকার বামের অংশ ছিল সবুজ, মাঝখানের অংশ ছিল আকাশী এবং ডানের অংশ ছিল লাল। পতাকাটি উলম্বভাবে এই তিনটি সমান অংশে বিভক্ত থাকতো। সবুজ রং ছিল কৃষি এবং সমতলের মুসলমানদের প্রতীক। আকাশী রং ছিল সত্য, সততা এবং পাহাড়ি মানুষদের নিয়েমত্রে ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। আর লাল রং ছিল রাজ্যের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতীক। পতাকার মাঝখানে ডান দিকে মুখ করা একটি সোনালি মাছের ছাপ থাকতো। এই মাছটি জৈন্তিয়ার রাজাদের শেকড়ের প্রতীক হিসেবে কাজ করতো (সুতংগা পুঞ্জির কিংবদন্তী অনুযায়ী, জৈন্তিয়ার রাজাদের আদি মাতা মাছের রূপ ধারণ করেছিলেন)। জোনাথান সাওইয়ান পতাকার একটি নমুনাও প্রস্তুত করেছেন যা শিলং শহরের ডন বস্কো জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

অধ্যায় ত্রিশ
জৈন্তিয়ার রাজ্যের ভাষা, লিপি ও সাহিত্য

ভাষা বৈচিত্রে জৈন্তিয়া ছিল বেশ সমৃদ্ধ একটি রাজ্য। এখানকার কথ্যভাষা ছিল প্নার (Pnar) ও সিলেটি ভাষা (সিলেটি ভাষা বাংলা নাকি স্বতন্ত্র ভাষা- এই বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এখানে তা নিষ্প্রয়োজন)। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল প্নার ভাষা। রাজপরিবারের লোকজনও এই ভাষায় কথা বলতেন। পার্বত্য অঞ্চলে আরও কিছু ভাষার অস্তিত্ব ছিল। এগুলো হচ্ছে- ওয়ার (War), বিয়াট (Biate), ভোই (Bhoi), সাকাচেপ (Sakachep) প্রভৃতি। জৈন্তিয়া সমতলের লোকজনের মাতৃভাষা ছিল সিলেটি ভাষা। হাজং, কুকী, বাংলা ও অসমীয়া ভাষাভাষী কিছু লোকও জৈন্তিয়া সমতলে বসবাস করতেন। কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে সিলেটি, বাংলা ও অসমীয়া ভাষার বর্ণমালা ছিল; বাকিগুলোর কোন বর্ণমালা ছিল না। রাজপরিবারের মাতৃভাষা অর্থাৎ প্নার ভাষার কোন বর্ণমালা না থাকায় সিন্টেং রাজারা তাদের সময়কার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখতে উৎসাহী হননি। এমনকি তারা কোন স্তুতিগাথাও লেখাননি। জৈন্তিয়ার ঐতিহাসিক দলিলের দুষ্প্রাপ্যতার মূল কারণ এটিই।

তবে বৈদেশিক সম্পর্কের প্রয়োজনে সিন্টেং রাজারা বেশ কিছু লিখিত দলিল সৃষ্টি করেছিলেন। আহোমের রাজাদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনে তারা অনেকগুলো পত্র লিখেছিলেন। এসব পত্রের ভাষা অসমীয়া ভাষা। এগুলো জৈন্তিয়ার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। মোগলানের সাথে জৈন্তিয়ার পত্র যোগাযোগের ভাষা ছিল বাংলা। জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রলিপি ও শিলালিপি ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে সেগুলোর ভাষা সংস্কৃত হলেও লিপি অত্যন্ত বিচিত্র। পূর্ব নাগরী লিপি (বাংলা ও অসমীয়া ভাষার লিপি) ও সিলেটি নাগরী লিপির (সিলেটি ভাষার লিপি) সংমিশ্রণে এগুলো রচিত হয়েছে। এই বিচিত্র লিপিতে বিভিন্ন তাম্রফলক ও শিলার গায়ে যেসব সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য লেখা হয়েছে সেগুলো জৈন্তিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈন্তিয়ার মুদ্রার ভাষাও সংস্কৃত। তবে মুদ্রার লিপি বেশ স্পষ্ট। মুদ্রাগুলোতে শুধু পূর্ব নাগরী লিপিই ব্যবহৃত হয়েছে; সিলেটি নাগরী লিপির সংমিশ্রণ ঘটেনি।

বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে বহু মুসলমান পরিবার জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা নিজস্ব পরিসরে নিজেদের ভাষায়ই কথা বলতেন। মোগলদের হাতে সিলেটের পতনের পর জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নেওয়া পাঠান পরিবারসমূহের ভাষা ছিল পশতু। তবে একসময় তারা মূলধারার সাথে মিশে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের হাতে বাংলার পতনের পর জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নেওয়া মুসলমানরা বাংলা, ফারসী, তুর্কী ইত্যাদি ভাষায় কথা বলতেন। তারাও একসময় মূলধারায় মিশে গিয়েছিলেন। তবে ধর্মীয় শিক্ষার ভাষা হিসেবে মুসলমানরা আরবি ভাষার চর্চা করতেন। ১৭৬৯ সালে জৈন্তিয়ার রাজকীয় ধর্মগুরু হযরত কাশিম শাহ মোকামবাড়িতে একটি আরবি কিতাবের দরসখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটিই জৈন্তিয়ার ইতিহাসের প্রথম আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হযরত কাশিম শাহ 'সিরাজুল ক্বলব' ও 'জমজমা' নামে দুটি আরবি বইও লিখেছিলেন। জৈন্তিয়ার অন্যান্য ধর্মের গুরুরাও তাদের শিষ্যদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। সনাতন ও বৈষ্ণব ধর্মীয় শিক্ষার মূল ভাষা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত। তাই জৈন্তিয়ায় বাংলা ও সংস্কৃতের পণ্ডিতদের অভাব ছিল না। জৈন্তিয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তিনি বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব ধর্মের কিছু 'ঝুলন সংগীত' রচনা করেছিলেন।

জৈন্তিয়ায় কিছু সাহিত্য উপাদানও রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রাঘবপাণ্ডবীয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'কবিরাজ' নামক একজন সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এটি একটি শ্লেষাত্মক ও দ্ব্যর্থবোধক মহাকাব্য (এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক বা পঙ্ক্তি এমন চাতুর্যের সাথে রচিত যে, এগুলোর একই সাথে দুটি অর্থ বের হয়ে আসে)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য নিদর্শন এই সংস্কৃত দ্ব্যর্থক মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল জৈন্তিয়ার রাজা কামদেবের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি মালব দেশের রাজধানী ধারানগরের অধিবাসী কবিরাজকে জৈন্তিয়া রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবিরাজ বিদ্যাধনঞ্জয় বা ধনঞ্জয় নামেও পরিচিত ছিলেন। দ্বাদশ শতকের (১১০১ সাল থেকে ১২০০ সাল) কোন এক সময়ে রাজা কামদেবের আমন্ত্রণে সাঁড়া দিয়ে তিনি জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন এবং রাজসভার কবি হয়েছিলেন। এরপর তিনি কামদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থের সূত্র ধরেই রাজা কামদেবের রাজত্ব এবং মধ্যদেশ থেকে জৈন্তিয়ায় ব্রাহ্মণদের আগমনের ঐতিহাসিক তথ্য ও কালানুক্রম জানা যায়।

জৈন্তিয়ার প্রত্নস্থানসমূহের তালিকা

জৈন্তাপুর উপজেলা (১৪টি), কানাইঘাট উপজেলা (২টি), গোয়াইনঘাট উপজেলা (১টি), বিয়ানীবাজার উপজেলা (১টি), ভারতের মেঘালয় রাজ্য (২টি)

জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ডের প্রত্নস্থানসমূহ (বাংলাদেশ)

১) জৈন্তিয়ার রাজদপ্তর (জৈন্তেশ্বরী বাড়ি) : জৈন্তাপুর উপজেলা সদর
২) জৈন্তিয়ার রাজকোষ (বড়দেউল) : জৈন্তাপুর উপজেলা সদর
৩) জাফলং রাজবাড়ি : জুমপার, বল্লাপুঞ্জি, জাফলং, গোয়াইনঘাট উপজেলা
৪) চারিকাটা রাজবাড়ি : ভিত্রিখেল, চারিকাটা, জৈন্তাপুর উপজেলা
৫) ফালজুর রাজবাড়িঃ বালিদাড়া, লালাখাল, জৈন্তাপুর উপজেলা
৬) বামজঙ্ঘা মহাপীঠঃ সনাতনপুঞ্জি, সুরইঘাট, কানাইঘাট উপজেলা
৭) জৈন্তিয়া রাজবাড়িঃ জৈন্তাপুর উপজেলা সদর
৮) সেনাপতি ফতেহ খাঁ-র মোকামঃ জৈন্তাপুর উপজেলা সদর
৯) মোকামবাড়িঃ জৈন্তাপুর উপজেলা সদর
১০) লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দিরঃ জৈন্তাপুর উপজেলা সদর
১১) হযরত শাহজির মোকামঃ ববরবন্দ, ফেরিঘাট, জৈন্তাপুর উপজেলা
১২) সোনাধনের বাড়িঃ বড়চতুল গ্রাম, কানাইঘাট উপজেলা
১৩) রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধিঃ শাপলা বিল, জৈন্তাপুর উপজেলা
১৪) ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরঃ সারীঘাট, ঢুপি, জৈন্তাপুর উপজেলা
১৫) ঢুপির সরাইখানাঃ সারীঘাট, ঢুপি, জৈন্তাপুর উপজেলা
১৬) সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দিরঃ ভিত্রিখেল, চারিকাটা, জৈন্তাপুর উপজেলা
১৭) লামনিগ্রামের মোকামঃ লামনিগ্রাম, জৈন্তাপুর উপজেলা

জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ডের প্রত্নস্থানসমূহ (ভারত)

১৮) নারতিয়াং মন্দিরঃ নারতিয়াং, ওয়েস্ট জৈন্তিয়া হিলস, মেঘালয়, ভারত
১৯) বড়ঘাটের মঠ সিয়েমঃ বড়ঘাট, ইস্ট জৈন্তিয়া হিলস, মেঘালয়, ভারত

জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ভূখণ্ডের প্রত্নস্থানসমূহ

২০) হাটকেশ্বর শিবমন্দিরঃ সেনগ্রাম, চারখাই, বিয়ানীবাজার উপজেলা

REFERENCE LIST

[এই পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত তথ্যসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছে প্রাথমিক গবেষণা থেকে। যেহেতু এই পাণ্ডুলিপিটিকে থিসিস বা অভিসন্দর্ভের মতো বিন্যস্ত করা হয়নি সেহেতু এর Reference List বা তথ্যসূত্র তালিকায় প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তসমূহের উৎস যোগ করার সুযোগ নেই। নিচে শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির গৌণ তথ্যসমূহের (Secondary Information) উৎস বা সূত্রসমূহ তোলে ধরা হল। সূত্রসমূহের ক্রম নির্ধারিত হয়েছে প্রকাশকাল বা প্রাচীনত্বের বিচারে। প্রতিটি সূত্রে যেসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা হলঃ লেখক/ সম্পাদক/ তত্ত্বাবধায়কের নাম, আকর গ্রন্থ বা দলিলের নাম (প্রকাশনার স্থান ও কাল), খণ্ড/ উপ-খণ্ড/ অধ্যায়/ উপ-অধ্যায় প্রভৃতি, পৃষ্ঠা নম্বর প্রভৃতি]

DR. JOHN PETER WADE, F.R.A.S., *AN ACCOUNT ASSAM (1800), EDITED BY BENUDHAR SHARMA* (ASSAM 1927)

GEORGE LOCH, *JAINTIA SETTLEMENT REPORT 1839 (জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্ট ১৮৩৯)*

ROBERT LINDSAY, *ANECDOTES OF AN INDIAN LIFE, ORIENTAL MISCELLANIES, LIVES OF THE LINDSAYS (VOLUME IV)* (WIGAN 1840), PAGE 48-55

THOMAS OLDHAM, A.M., F.R.S., G.S., *ON THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF PART OF THE KHASI HILLS WITH OBSERVATION ON THE METEOROLOGY AND ETHNOLOGY OF THAT DISTRICT* (CALCUTTA 1854)

W.J. ALLEN, *REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE COSSAYAH AND JYNTEAH HILL TERRITORY* (CALCUTTA 1858)

E.M. LEWIS, *PRINCIPAL HEADS OF THE HISTORY AND STATISTICS OF THE DACCA DIVISION* (1868), PART: *DISTRICT OF SYLHET*

SIR ALEXANDER MACKENZIE, *MEMORANDUM ON THE NORTH-EAST FRONTIER OF BENGLE* (CALCUTTA 1869), PAGE 233 OR *HISTORY OF THE RELATIONS OF THE GOVERNMENT WITH THE HILL TRIBES OF THE NORTH-EAST FRONTIER OF BENGAL* (CALCUTTA 1884)

শ্রীকৃষ্ণ দাস, *রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্য*, জ্ঞানাঙ্কুর (বৈশাখ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ)

SIR WILLIAM WILSON HUNTER B.A., L.L.B., C.I.E, *A STATISTICAL ACCOUNT OF ASSAM VOLUME II* (LONDON 1879), PART: THE KHASI AND JAINTIA HILLS, CHAPTER: PHYSICAL-HISTORY, PAGE 206-207

শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত, *ভারতের ইতিহাস (হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব)* (কলকাতা ১৮৮৭)

SIR JOSEPH DALTON HOOKER, K.C.S.I., C.B., M.D., D.C.L., F.R.S., *HIMALAYAN JOURNALS OR NOTES OF A NATURALIST* (LONDON, NEW YORK, MELBOURNE 1891)

SIR EDWARD ALBERT GAIT, K.C.S.I., C.I.E., *SOME NOTES ON JAINTIA HISTORY* (1895); *REPORT ON THE PROGRESS OF HISTORICAL RESEARCH IN ASSAM* (SHILLONG 1897); *A HISTORY OF ASSAM*, SECOND EDITION (CALCUTTA 1926), CHAPTER VII: *THE CLIMACTERIC OF AHOM RULE* (PAGE 172-180), CHAPTER X: *THE KACHARIS* (PAGE 252-253, 255-256), CHAPTER XI: *THE JAINTIA KINGS* (PAGE 259-268)

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস (আগরতলা ১৮৯৬)

BABU CHANDRA KANTA SEN, *SETTLEMENT REPORT OF JAINTIA PARGANAS (1897)*

B.C. ALLEN, B.A. C.S., *CENSUS OF INDIA 1901 VOLUME IV: ASSAM* (SHILLONG 1902); *ASSAM DISTRICT GAZETTEER VOLUME I* (ALLAHABAD 1905); *ASSAM DISTRICT GAZETTEER VOLUME II: SYLHET* (CALCUTTA 1905)

REV. WILLIAM M. JENKINS, *LIFE AND WORK IN KHASIA* (NEWPORT, MONMOUTHSHIRE 1904)

শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ* (কলকাতা ১৯১০), প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়: *তীর্থ স্থান (বামজঙ্ঘাপীঠ, পীঠপ্রকাশ, রূপনাথ গুহা, হাটকেশ্বর শিব, আগমবাগীশ ও হাটকেশ্বর);* দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড: *মোসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া* (প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়)

F.B. BRADLEY BIRT, *'SYLHET' THACKERAY* (LONDON 1911), CHAPTER VI: *FIRST COLLECTOR OF SYLHET* (PAGE 127-152), CHAPTER VII: *THE JAINTIA EXPEDITION* (PAGE 153-176)

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি.এ., *কাছাড়ের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা ১৯১২)

LIEUTENANT-COLONEL PHILIP RICHARD THORNHAGH GURDON, C.S.I., *THE KHASIS,* SECOND EDITON (LONDON 1914)

WALTER KELLY FIRMINGER, *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME I (1770–1785)* (SHILLONG 1913); *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME II (1786–1788)* (SHILLONG 1917); *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME III (1786–1788)* (SHILLONG 1917); *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME IV (1788–1791)* (SHILLONG 1919)

PROF. KISHORI MOHAN GUPTA, M.A., Ph.D., *THE DHUPI COPPERPLATE INSCRIPTION OF RAMASIMHA, SAKABDA 1720 (A.D. 1798)*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 18, 1922, PAGE 73-79;

DAUDIG COPPER PLATE INSCRIPTION OF KASASATI, SAKABDA 1725 (A.D. 1803), JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 19, 1923, PAGE 323-329; *JAINTIAPUR COPPER PLATE INSCRIPTION OF BADAGOSAYI, A.D. 1770*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 19, 1923, PAGE 331-335; *JAINTIAPUR COPPER-PLATE OF INSCRIPTIONS OF MAHADEVI KASASATI, DATED SAKABDA 1710 (A.D. 1788), 1723 (A.D. 1801) AND 1735 (A.D. 1813),* THE JOURNAL OF THE ASSAM RESEARCH SOCIETY (KAMARUPA ANUSANDHAN SAMITI), VOLUME 1, NUMBER 1, APRIL 1933

J.H. HUTTON, *SOME MEGALITHIC WORK IN THE JAINTIA HILLS*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 22, 1926, PAGE 333-345

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (সিলেট ১৯৬৪), *চতুলের সোনাধনের কবিতা* (সিলেট ১৯২৭)

KUNJA GOVINDA GOSWAMI, *THE SATAK COPPER PLATE GRANT OF KING RAMA SIMHA II OF JAINTIA OF 1809 A.D.*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 25, 1929, PAGE 165-169

A.W. BOTHAM, C.S.I., C.I.E., I.C.S., *CATALOGUE OF THE PROVINCIAL COIN CABINET ASSAM, SECOND EDITION* (ALLAHABAD 1930)

RAI SAHIB GOLAP CHANDRA BARUA, *AHOM-BURANJI (FROM THE EARLIEST TIME TO THE END OF AHOM RULE)* (CALCUTTA 1930)

ৰায় বাহাদুৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা (SURJYA KUMAR BHUYAN), *কামৰূপৰ বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩০), *দেওধাই অসম বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩২), *অসমৰ পদ্য বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৩), *কছাৰী বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৬), *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৭), *ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৮), *অসম বুৰঞ্জীৰ কথা* (গুৱাহাটী ১৯৩৯), *মীৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণ* (গুৱাহাটী ১৯৫৬), *সাতসৰী অসম বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৬০), *AN ACCOUNT OF ASSAM* (GUWAHATI 1940)

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী, *পল্লীস্মৃতি*, বাংলার শক্তি (কলকাতা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)

KHAN CHOWDHURI AMANATULLA AHMED, *HISTORY OF COOCH BEHAR (IN BENGALI) PART I* (COOCH BEHAR 1936)

U HOMIWELL LYNGDOH, M.B.E., L.M.S., *KI SYIEM KHASI BAD SYNTENG* (SHILLONG 1938)

RAMANANDA CHATTERJEE, *DUTTA CHOWDHURY FAMILY RECORDS*, THE MODERN REVEIW (CALCUTTA 1940)

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম.এ., বি.লিট., পি.এইচ.ডি., *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* (কলকাতা ১৯৪২)

মৌলভী সিকান্দার আলী খন্দকার, *পারিবারিক ডায়েরি ও টালি খাতাসমূহ* (১৯৫৬)

SYED MURTAZA ALI, *THE HISTORY OF JAINTIA* (DACCA 1954); *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (ঢাকা ১৯৬৫), অধ্যায়: *থেকারে, লিন্ডসে, জয়ন্তীয়া*

RAJMOHAN NATH, B.E., *ANTIQUITIES OF KACHAR* (1942), *THE BACKGROUND OF ASSAMESE CULTURE* (SHILLONG 1948), *GLORIOUS ASSAM* (1948), *সোনাধনের গীত* (সিলেট ১৯৪৭)

KAMALAKANTA GUPTA, M.Sc., B.L., *COPPER PLATES OF SYLHET, VOLUME I* (7TH—11TH CENTURY A.D.) (SYLHET 1967), *তাম্রশাসনে শ্রীহট্ট* (সিলেট ২০১৯), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা* (ঢাকা ২০১৭), *শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস* (?)

DR. HAMLET BAREH, *MEGHALAYA* (SHILLONG 1974)

পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা, অসমৰ বুৰঞ্জী (গুৱাহাটী ১৯৭৬)

JYOTIRINDRA NATH CHOWDHURY, *THE KHASI CANVAS: A CULTURAL AND POLITICAL HISTORY* (SHILLONG 1978), *KI KHUM KHASI-KHARA (THE KHASI PEOPLE)* (SHILLONG 1996)

A.J.M. MILLS *REPORT ON THE KHASI AND JAINTIA HILLS 1853* (SHILLONG 1985)

DR. D. NATH, *HISTORY OF THE KOCH KINGDOM (c.1515-1615)* (DELHI 1989)

গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* (ঢাকা ১৯৯১), প্রথম খণ্ড *(সিলেটের মাটি)*, অধ্যায়: *প্রাচীন কাল (বামজঙ্ঘা পীঠ, মহাভারতের যুগে সিলেট, জৈন্তাপতি কামদেব ও রাঘবপাণ্ডবীয় গ্রন্থ, হট্টনাথের পাঁচালী ও সিলেট),* অধ্যায়: *খণ্ডরাজ্যের ইতিকথা (গৌড় রাজ্য ও রাজা গৌড়গোবিন্দ, মগধ রাজ্য ও প্রতাপগড়, জৈন্তা রাজ্যের কথা);* দ্বিতীয় খণ্ড *(সিলেটের মানুষ),* অধ্যায়: *সেনাপতি ফতেহ খাঁ, হ্যারী ইনগলিস* এবং *জৈন্তিয়া দর্পণ* (ঢাকা ২০০১)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুনিমল দত্ত চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, *শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির* রূপরেখা (শিলং ১৯৯৬)

H.M. BAREH, *ENCYCLOPEDIA OF NORTH EAST INDIA VOLUME II: ASSAM* (NEW DELHI 2001), *ENCYCLOPEDIA OF NORTH EAST INDIA VOLUME IV: MEGHALAYA* (NEW DELHI 2001)

SOUMEN SEN, *KHASI-JAINTIA FOLKLORE- CONTEXT, DISCOURSE AND HISTORY* (CHENNAI 2004)

রুশ পতাম, *খাসিয়া জনগোষ্ঠী: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা ২০০৫)

মো. খায়রুল ইসলাম, *নারতিয়াং মন্দিরের পুরোহিতের সাক্ষাৎকারের ভিডিও* (নারতিয়াং ২০১৮)

PROF. RAVI POOVAIAH AND **JONATHAN SAWIAN**, *THE JAINTIA KINGS: INFORMATION VISUALIZATION OF JAINTIA AND CULTURE*

PROF. RAVI POOVAIAH AND **JONATHAN SAWIAN,** *KA HISTORY KA RI JAINTIA HA SHWA KIPHARENG*, *RI JAINTIA*, END NEWS, KHLIEHRIAT, 26 AUGUST 2023

হাবিব আহমদ দত্তচৌধুরী, *বাংলার ইতিহাসের অনাঘ্রাত পাতা থেকে* (ঢাকা ২০২৪), *শ্রীহট্টের বীরশ্রী-মাইজডিহির রাজবংশের ইতিকথা* (সিলেট ২০২৫), *ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীহট্টের প্রতাপগড় রাজ্য* (ঢাকা ২০২৪)

ASIF AJHAR, *AN ACCOUNT OF THE JAINTIA KINGDOM* (ONLINE 2026)

আক্তার হোসেন অবিন, ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা জৈন্তিয়া রাজ্যের মুদ্রার সংগ্রহ